শাদা পৃথিবী

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গ্রন্থকারের নিবেদন

এই গ্রন্থের কাহিনীগুলি রচনাব কালানুক্রমে নিবেশিত হইয়াছে। 'মায়া কানন' বঙ্কিম শতবার্ষিকী উপলক্ষে 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত হইয়াছিল। বাকিগুলি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন, গত তিন বৎসরে লিখিত।

'শাদা পৃথিবী' রচনাটি ঠিক গল্প নয়; উহা আমার মনের উপর আনবিক বোমার প্রতিক্রিয়া। রচনাটি পড়িয়া পাঠকের মনে হইতে পারে, উহা অবান্তর। পাঠককে স্মরণ রাখিতে বলি যে আণবিক বোমা আবিস্কারের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যজাতির জীবনেব ধারা পরিবর্তিত হইয়াছে। অতীতের সহিত তাহার ধারাবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে। আমরা অকস্মাৎ এক সম্পূর্ণ নূতন ও অপ্রত্যাশিত পরিবেশের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছি। মানুষ যেদিন প্রথম কৃষি আবিষ্কার করিয়াছিল সেদিনও তাহার জীবনের ধারা এমনি অকস্মাৎ মোড় ঘুরিয়া গিয়াছিল। তফাৎ এই যে, কৃষি মানুষের জীবন-সম্ভাবনাকে বাড়াইয়া দিয়াছিল, আণবিক বোমা করিয়াছে ঠিক তাহার বিপরীত। 'শাদা পৃথিবী' আষাঢ়ে গল্প নয়, ভবিষ্যদ্বাণীও নয়, ইহা আশঙ্কাসঞ্জাত সতর্কবাণী।

'তক্ত্ মোবাবক' ঐতিহাসিক কাহিনী। পূর্বে আমি যত ঐতিহাসিক কাহিনী লিখিয়াছি, রোমান্সই ছিল তাহাদের লক্ষ্য; 'তক্ত্ মোবারক' গল্পে ইতিহাসের মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান করিযাছি।

'ইন্দ্রকতূলক' রচনাটি কেহ গাম্ভীর্যের সহিত গ্রহণ করিবেন এরূপ আশা করি না। উহা 'হইলে হইতে পারিত' গোছের পরিকল্পনা; কিন্তু

জ্ঞাত ইতিহাসের সহিত তাহার কোথাও বিরোধ নাই। আর্যদের আদি বাসভূমি কোথায় ছিল এই ঐতিহাসিক তর্কের এখনও মীমাংসা হয় নাই। আর্যগণ য়ুরোপের আদিম অধিবাসী ছিলেন ইহা যেমন সাহেবদের আষাঢ়ে গল্প, আমার গল্প হয়তো ততটাই আষাঢ়ে, তাহার বেশী নয়।

মালাড
কার্ত্তিক, ১৩৫৫

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

গল্পের অনুক্রম

শাদা পৃথিবী

শাদা পৃথিবী

✓ মায়া কানন

"অতি বিস্তৃত অরণ্য। অরণ্য মধ্যে অধিকাংশ বৃক্ষই শাল, কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও অনেক জাতীয় গাছ আছে। গাছের মাথায় মাথায় পাতায় পাতায় মেশামিশি হইয়া অনন্ত শ্রেণী চলিয়াছে। বিচ্ছেদশূন্য ছিদ্রশূন্য আলোক প্রবেশের পথমাত্র শূন্য; এইরূপ পল্লবের অনন্ত সমুদ্র, ক্রোশের পর ক্রোশ পবনের তরঙ্গের উপর তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিয়াছে······"

বনের মধ্যে কিন্তু অন্ধকার নাই। ছায়া আছে, অন্ধকার নাই। চন্দ্রসূর্যের রশ্মি প্রবেশ করে না, তবু বন অপূর্ব আলোকে প্রভাময়। কোথা হইতে এই স্বপ্নাতুর আলোক আসে কেহ জানে না। হয় তো ইহা সেই আলো যাহা স্বর্গ মর্ত্যে কোথাও নাই—The light that never was on Land or Sea—

এই বনে একাকী ঘুরিতেছিলাম। মানুষের দেখা এখনও পাই নাই, কিন্তু মনে হইতেছে আশেপাশে অনেক লোক ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। একবার অদৃশ্য অশ্বের দ্রুত ক্ষুরধ্বনি শুনিলাম, কে যেন

ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়াছে। পিছনে রমণীকণ্ঠ গাহিয়া উঠিল,—'দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাও রে!'

অশ্বারোহী ভারী গলায় উত্তর দিল,—'সমরে চলিনু আমি হামে না ফিরাও রে।'

ক্ষুরধ্বনি মিলাইয়া গেল।

বনের মধ্যে পায়ে হাঁটা পথের অস্পষ্ট চিহ্ন আছে; তাহার শেষে একটা ভাঙা বাড়ী। ইটের স্তূপ; তাহার উপর অশথ বাব্‌লা আরও কত আগাছা জন্মিয়াছে।

বহুদিন আগে হয় তো ইহা কোনও অখ্যাত রাজার অট্টালিকা ছিল। এই ভগ্নস্তূপের সম্মুখে হঠাৎ একজনের সহিত মুখোমুখি দেখা হইয়া গেল। মজবুত দেহ, গালে গালপাট্টা, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, হাতে মোটা বাঁশের লাঠি। বিস্মিত হইয়া বলিলাম,—'একি, দাড়ি বাবাজী! আপনি এখানে?'

দাড়ি বাবাজির চোখে একটা আগ্রহপূর্ণ উৎকণ্ঠা। তিনি বলিলেন,—'দেবীকে খুঁজ্‌তে এসেছিলাম। এটা দেবীর পুরানো আস্তানা।'

'দেবী চৌধুরাণী?'

'হাঁ। দেবী নেই। দিবা নিশিও কোথায় চলে গেছে। রঙ্গরাজের কণ্ঠস্বর ব্যগ্র হইয়া উঠিল,—'তুমি জানো দেবী কোথায়? তাঁকে বড় দরকার। ত্রিস্রোতার মোহানায় বজ্‌রা নোঙর করা আছে। তাঁকে এখনি যেতে হবে। তুমি জানো তিনি কোথায়?'

নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম,—'দেবী মরেছে। প্রফুল্ল ছিল, সেও ব্রজেশ্বরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছে। আর তাকে পাবে না।'

'পাব না!' রঙ্গরাজের রাঙা তিলকের নীচে চক্ষু দুটা জ্বলিয়া

উঠিল,—'নিশ্চয় পাব। দেবীকে না হলে যে চলবে না। তাঁকে চাইই। যেমন করে হোক খুঁজে বার করতে হবে। ত্রিস্রোতার মোহানায় বজ্‌রা অপেক্ষা করছে। ব্রজেশ্বরের সাধ্য কি মা'কে ধরে রাখে।'

রঙ্গরাজ চলিয়া গেল। শুধু নিষ্ঠা এবং একাগ্র বিশ্বাসের বলে দেবীকে সে খুঁজিয়া পাইবে কিনা কে বলিতে পারে।

কিশোর কণ্ঠের মিঠে গান শুনিয়া চমক ভাঙিল। কয়েকটি বালিকা কাঁখে কলসী লইয়া মল্ বাজাইয়া চলিয়াছে—

চল্ চল্ সই জল আনিগে জল আনিগে চল্।

সকৌতুকে তাহাদের পিছু পিছু চলিলাম। কোন্ জলাশয়ে ইহারা জল আনিতে চলিয়াছে জানিতে ইচ্ছা হইল। আঁকিয়া বাঁকিয়া পায়ে হাঁটা পথে তাহারা স্বচ্ছন্দ চরণে চলিয়াছে, গানও চলিতেছে—

বাজিয়ে যাব মল।

অবশেষে তরুবেষ্টিত উচ্চ পাড়ের ক্রোড়ে একটি প্রকাণ্ড সরোবর চোখে পড়িল। নীল জল নিস্তরঙ্গ, দর্পণের মত আলোক প্রতিফলিত করিতেছে। মনে প্রশ্ন জাগিল, এ কোন্ জলাশয়? যে-দিঘির নিকট ইন্দিরার পালকির উপর ডাকাত পড়িয়াছিল সেই দিঘি? রোহিণী যাহার জলে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল সেই বারুণী জলাশয়? কিম্বা শৈবলিনী যাহার জলে দাঁড়াইয়া লরেন্স্ ফস্টরকে মজাইয়াছিল সেই ভীমা পুষ্করিণী?

ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া বালিকাদের আর দেখিতে পাইলাম না। বিস্তৃত ঘাটের অগণিত সোপান ধাপে ধাপে নামিয়া জলের মধ্যে ডুবিয়াছে।

ঘাটের শেষ সোপানে জলে পা ডুবাইয়া একটি রমণী বসিয়া আছে, পরিধানে শুভ্র বস্ত্র, রুক্ষ কেশরাশি পৃষ্ঠ আবৃত করিয়া মাটিতে লুটাইতেছে। বর্মাবৃত শিরস্ত্রাণধারী এক পুরুষ তাহার পাশে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিতেছেন,—'মনোরমা, এই পথে কাহাকেও যাইতে দেখিয়াছ?'

'দেখিয়াছি।'

'কাহাকে দেখিয়াছ? কিরূপ পোষাক?'

'তুর্কির পোষাক।'

হেমচন্দ্র সবিস্ময়ে বলিলেন,—'তুমি তুর্কি চেন? কোথায় দেখিলে?'

মনোরমা ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার মুখে বিচিত্র হাসি। আমি পা টিপিয়া টিপিয়া সরিয়া আসিলাম, তাহাদের কথাবার্তা অধিক শুনিতে ভয় হইল।

সেখান হইতে সরিয়া গিয়া বনের যে অংশে উপস্থিত হইলাম তাহা উদ্যানের মত সুন্দর। লতায় লতায় ফুল ধরিয়াছে, বৃহৎ বৃক্ষের শাখা হইতে ভাস্বর আলোকলতা ঝুলিতেছে। একটা কোকিল বুক-ফাটা স্বরে ডাকিতেছে—কুহু কুহু—

একি সেই কোকিলটা, ঘাটে যাইতে যাইতে রোহিণী যাহার ডাক শুনিয়া উন্মনা হইয়াছিল?

এক তরুতলে দুইটি রমণী রহিয়াছে। রূপের তুলনা নাই, তরুমূল যেন আলো হইয়াছে। একটি ক্ষুদ্রকায়া, তন্বী, মুকুলিত যৌবনা;, ফোটে ফোটে ফোটে না। অন্যটি বিশালনয়না, পরিস্ফুটাঙ্গী রাজেন্দ্রাণী, শান্ত অথচ তেজোময়ী। উভয়ের বক্ষে জরীর কাঁচুলি; সূক্ষ্ম মলমলের ওড়না চন্দ্রকিরণের মত অনিন্দ্য সুন্দর তনুলতা বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে।

আয়েষা বলিলেন,—'ভগিনী, তুমি বিষপান করিলে কেন? আমিও

তো মরিতে পারিতাম কিন্তু মরি নাই, গরলাধার অঙ্গুরীয় দুর্গপরিখার জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম।'

দলনীর গোলাপ কোরকের মত ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল, সে বলিল,—'আয়েষা, তুমি জানিতে তোমার হৃদয়েশ্বরকে পাইবে না, কোনও দিন পাইতে পার না। তোমার কত দুঃখ? কিন্তু আমি যে পাইয়াছিলাম, পাইয়া হারাইয়াছিলাম—' মুক্তাবিন্দুর মত অশ্রু দলনীর গণ্ড বহিয়া ঝরিয়া পড়িল। এখান হইতেও পা টিপিয়া টিপিয়া সরিয়া গেলাম।

অনতিদূরে আর একটি বৃক্ষতলে এক রমণী মাটীতে পড়িয়া কাঁদিতেছে। রোদনের আবেগে তাহার দেহ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, পৃষ্ঠে বিলম্বিত কৃষ্ণবেণী কাল ভুজঙ্গিনীর মত তাহাকে দংশন করিতেছে। রমণীর বাষ্পবিকৃত কণ্ঠ হইতে কেবল একটি নাম গুমরিয়া গুমরিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে,—'হায় মোবারক! মোবারক! মোবারক!'

বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী
বিললাপ বিকীর্ণমূর্ধজা।

এই বেদনাবিধুর উপবনে শব্দ করিতে ভয় হয়। বাতাস যেন এখানে ব্যথাবিদ্ধ হইয়া নিস্পন্দ হইয়া আছে। আমি এই অশ্রুভারাতুর উদ্যান ছাড়িয়া যাইবার চেষ্টা করিলাম।

পুষ্পোদ্যান প্রায় উত্তীর্ণ হইয়াছি, একটি লতানিকুঞ্জ হইতে হাসির শব্দে সেইদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। দুইটি স্ত্রীপুরুষ যেন রঙ্গ তামাসা করিতেছে, হাসিতেছে, মৃদুকণ্ঠে কথা কহিতেছে। চাবির গোছা, চুড়ি, বালা ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেছে।

বড় লোভ হইল; চুপি চুপি গিয়া লতার আড়াল হইতে উঁকি মারিলাম। লবঙ্গলতার আঁচল ধরিয়া রামসদয় টানাটানি করিতেছেন। লবঙ্গলতা বলিতেছে,—'আঁচল ছাড়, এখনি ছেলেরা দেখতে পাবে। বুড়ো মানুষের অত রস কেন?'

রামসদয় বলিলেন,—'আমি যদি বুড়ো, তুমিও তবে বুড়ী।'

লবঙ্গ বলিল,—'বুড়োর বৌ যদি বুড়ী হয়, ছুড়ির বরও তবে ছোঁড়া।'

রামসদয় আঁচল টানিয়া লবঙ্গলতাকে কাছে আনিলেন, বলিলেন,—'সে ভাল। তুমি বুড়ি হওয়ার চেয়ে আমিই ছোঁড়া হলাম। এখন ছোঁড়ার পাওনাগণ্ডা বুঝিয়ে দাও।' বলিয়া তাহার মুখের দিকে মুখ বাড়াইলেন।

আমার পিছন হইতে কে বলিয়া উঠিল—'আ ছি ছি ছি—'

লজ্জা পাইয়া সরিয়া আসিলাম। কে ছি ছি বলিল দেখিবার জন্য চারিদিকে চাহিলাম কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না।

দূর হইতে একটা শব্দ আসিল—মিউ!

বিড়াল! এ বনে বিড়ালও আছে। মিউ শব্দ অনুসরণ করিয়া খানিকদুর যাইবার পর দেখিলাম, ঘাসের উপর একটি বৃদ্ধগোছের লোক বসিয়া ঝিমাইতেছে; গলায় উপবীত, গালদুটি শুষ্ক, চক্ষু প্রায় নিমীলিত। একটি শীর্ণকায় বিড়াল তাহার সম্মুখে বসিয়া মাঝে মাঝে মিউ মিউ করিতেছে।

বৃদ্ধ বলিল,—'মার্জার পণ্ডিতে, তোমার কথাগুলি বড়ই সোশ্যালিষ্টিক্। আমি তোমাকে বুঝাইতে পারিব না, তুমি বরং প্রসন্ন গোয়ালিনীর কাছে যাও। সে তোমাকে দুগ্ধ দিতে পারে কিম্বা ঝাঁটাও মারিতে পারে। তা দুগ্ধ অথবা ঝাঁটা যাহাই খাও তোমার দিব্যজ্ঞান জন্মিবে। আর যদি তুরীয়-সমাধি লাভ করিয়া পরব্রহ্মে লীন হইতে চাও, আমার কাছে

ফিরিয়া আসিও—এক সরিষা ভর আফিম দিব। এখন তুমি যাও, আমি মনুষ্যফল সম্বন্ধে চিন্তা করিব।'

বিড়াল নড়িল না। তখন কমলাকান্ত বলিলেন,—'দেখ, বঙ্গদেশে সম্পাদক জাতীয় যে জীব আছে, ফলের মধ্যে তাহারা লঙ্কার সহিত তুলনীয়। দেখিতে বেশ সুন্দর, রাঙা টুকটুক্ করিতেছে; মনে হয় কতই মিষ্টরসে ভরা। কিন্তু বড় ঝাল। দেখিও, কদাপি চিবাইবার চেষ্টা করিও না, বিপদে পড়িবে। সম্পাদকের কোপে পড়িলে আর তোমার রক্ষা নাই, বড় বড় ঝাঁঝালো লীডার লিখিয়া তোমার দফারফা করিয়া দিবে।'

অনেকগুলি সম্পাদকের সহিত সদ্ভাব আছে, তাই আমি আর সেখানে দাঁড়াইলাম না; কি জানি তাঁহারা মনে করিতে পারেন কমলাকান্ত চক্রবর্তীর মতামতের সহিত আমার সহানুভূতি আছে!

একজন শীর্ণাকৃতি লোক দীর্ঘ পা ফেলিয়া আসিতেছে আর মাঝে মাঝে পিছন ফিরিয়া তাকাইতেছে; কেহ যেন তাহাকে তাড়া করিয়াছে। লোকটির বগলে পুঁথি, অদ্ভুত সাজ-পোষাক—হিন্দু কি মুসলমান সহসা ঠাহর করা যায় না। আমাকে দেখিয়া সে বলিল—'খোদা খাঁ বাবুজীকে কুশলে রাখুন। ঘৃতভাণ্ডকে এদিকে দেখিয়াছেন?'

অবাক হইয়া বলিলাম,—'ঘৃতভাণ্ড?'

সে বলিল,—'বিমলা আমার ঘৃতভাণ্ড। মোচলমান বাবারা যখন গড়ে এলেন, আমাকে বললেন, আয় বামুন তোর জাত মারি—'

'ও—আপনি বিদ্যাদিগ্‌গজ মহাশয়!'

'উপস্থিত শেখ দিগ্‌গজ'—পিছন দিকে তাকাইয়া শেখ সভয়ে বলিলেন,—'ঐ রে, বুড়ী আসিতেছে, এখনি রূপকথা শুনাইবে—'

সুদীর্ঘ পদযুগলের সাহায্যে গজপতি নিমেষ মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন।

ক্ষণেক পরে বুড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। হাতে জপের মালা, বুড়ী আপনমনে বিড়্ বিঁড়্ করিয়া কথা বলিতেছে—'সাগর আমার চরকা ভেঙে দিয়েছে। বামুনকে দুটো পৈতে তুলে দিতাম—তা যাক—' আমাকে দেখিয়া বুড়ীর নিষ্প্রভ চক্ষুর্দ্বয় ঈষৎ উজ্জ্বল হইল—'ব্রেজ দাঁড়িয়ে আছিস! প্রফুল্ল ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে বুঝি? তোর যেমন বাগ্দিনী না হলে মন ওঠে না—বেশ হয়েছে। তা আয়, আমার কাছেই না হয় শো—'

কি সর্বনাশ! বুড়ী আমাকে ব্রজেশ্বর মনে করিয়াছে। পলাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ব্রহ্ম ঠাকুরাণীর হাত ছাড়ানো কঠিন কাজ। —'রূপকথা শুন্‌বি। তবে বলি শোন্, এক বনের মধ্যে শিমুল গাছে—'

শেষ পর্যন্ত শুনিতে হইল। ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর গল্প শুনিয়া কিন্তু আশ্চর্য হইয়া গেলাম। বস্তুতন্ত্র একেবারে নাই। এত চমৎকার গল্প গত দশ বৎসরের মধ্যে কেহ লেখে নাই হলফ্ লইয়া বলিতে পারি।

ব্রহ্ম ঠাকুরাণীর নিকট বিদায় লইয়া আবার চলিয়াছি। বন যেন আরও নিবিড় হইয়া আসিতেছে। এ বনের শেষ কোথায় জানিনা। শেষ আছে কি? হয় তো নাই, জগৎব্রহ্মাণ্ডের মত ইহাও অনন্ত অনাদি, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ।

গাছপালায় ঢাকা একটি ক্ষুদ্র কুটিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। মাটির কুঁড়ে ঘর, কিন্তু তক্‌তক্ ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। একটি সতেরো আঠারো বছরের মেয়ে হাসিমুখে আমার সম্বর্ধনা করিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'নিমাইমণি, জীবানন্দ কোথায়?'

নিমাইমণির হাসিমুখ ম্লান হইয়া গেল, চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। 'দাদা নেই ; শান্তিও চলে গেছে। সেই যে সিপাহিদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল তারপর থেকে আর তারা আসেনি। ঐ ছাখো না, শান্তির ঘর খালি পড়ে রয়েছে।'

শান্তির ঘর দেখিলাম। পাখী উড়িয়া গিয়াছে, শূন্য পিঞ্জরটা পড়িয়া আছে। বুকের অন্তস্তল হইতে একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। নিমাইমণি চোখে আঁচল দিয়া বলিল,—'সেই থেকে রোজ তাদের পথ চেয়ে থাকি। হ্যাগা, আর কি তারা আসবে না?'

আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম। আব আসিবে কি? জীবানন্দের ন্যায় পুত্র, শান্তির ন্যায় কন্যা বঙ্গজননী আর গর্ভে ধরিবে কি?

'জানিনা' বলিয়া বিষণ্ণচিত্তে ফিরিয়া চলিলাম।

পিছন হইতে নিমাইমণির করুণ স্বর আসিল,—'কিছু খেয়ে গেলেনা? গেরস্তর বাড়ী থেকে না খেয়ে যেতে নেই—'

* * * *

জীবানন্দ গিয়াছে, শান্তি গিয়াছে; দেবীকে রঙ্গরাজ খুঁজিয়া পাইতেছে না। তবে কি তাহারা কেহই নাই, কেহই ফিরিয়া আসিবে না? সীতারাম রাজসিংহ মৃণ্ময় চন্দ্রচূড় ঠাকুর—ইহারা চিরদিনের মত চলিয়া গিয়াছে?

বনের অনৈসর্গিক আলো ক্রমে নিভিয়া আসিতে লাগিল। প্রথমে ছায়া, তারপর অন্ধকার, তারপর গাঢ়তর অন্ধকার। সূচীভেদ্য অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইতেছি না। মহাপ্রলয়ের কৃষ্ণ জলরাশির মধ্যে আমি ডুবিয়া যাইতেছি। চেতনা লুপ্ত হইয়া আসিতেছে।

সহসা এই প্রলয় জলধি মথিত করিয়া জীমূতমন্দ্রকণ্ঠে কে গাহিয়া উঠিল—বন্দে মাতরম্‌!

আছে আছে—কেহ মরে নাই। ঐ বীজমন্ত্রের মধ্যে সকলে লুক্কায়িত আছে। দেবী আছে, জীবানন্দ আছে, সীতারাম আছে—

আবার তাহারা আসিবে—ঐ বীজমন্ত্রের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করিতে যেটুকু বিলম্ব। আবার আসিবে! আমিও ক্ষীণ দুর্বলকণ্ঠে সেই অমা-তমস্বিনী রাত্রির মধ্যে চিৎকার করিয়া উঠিলাম—বন্দে মাতরম্‌!

স্মর-গরল

ভোর বেলায় রান্নাঘরের মেঝেয় উপু হইয়া বসিয়া শশী ঝি চা তৈয়ার করিতেছিল এবং মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিল। তাহার সম্মুখে দুটি সুশ্রী গড়নের ভাল পেয়ালা, একটি মোটা চীনা-মাটির শক্ত পেয়ালা এবং একটি পিতলের গেলাস। গেলাসে দুধ রহিযাছে। সৌখীন পেয়ালা দুটি মামাবাবু ও নবীনা মামীমার জন্যে; মোটা পেয়ালাটি রতনের; এবং পেয়ালায় দুধ ঢালিয়া গেলাসে যাহা বাকি থাকিবে তাহাতেই অবশিষ্ট চায়ের জল ঢালিয়া শশীর নিজের চা হইবে। শশী চা ছাঁকিতে ছাঁকিতে নিজের মনে হাসিতেছিল, যেন এই চা ছাঁকার ব্যাপারে অনেকখানি দুষ্ট রসিকতা জড়িত আছে

এক জাতীয় লঙ্কা আছে যাহা কাঁচা বেলায় কালো থাকে, পাকিলে কালোর সহিত লাল মিশিয়া একটা গাঢ় ঘন বেগুনী বর্ণ ধারণ করে। শশীর গায়ের রঙ্ ঠিক সেই রকম; যেন তাহার চামড়ার নীচেই লাল এবং কালোর একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছে। শশীর বয়স তেইশ-চব্বিশ; আঁট সাঁট কঠিন কর্মঠ যৌবন তাহার দেহে—এবং মনে তাহার একটি আদিম ভাবনা। লঙ্কার সহিত উপমাটা টানিয়া লইয়া গেলে বলা যায়, তাহার মনের মধ্যেও লঙ্কার ঝালের মত একটা দাহ অহরহ জ্বলিতেছে। তাহার চোখের দৃষ্টি কেরাসিনের কুপির ধূম-দূষিত শিখার মত যেন অন্তরের ঐ অনির্বাণ দহনই প্রকাশ করিতেছে। সেকালে এই জাতীয় স্ত্রীলোকের একটী সংজ্ঞা ছিল—হস্তিনী।

চা ছাঁকা শেষ করিয়া শশী নিজের গেলাসে বেশী করিয়া চিনি মিশাইল, তারপর আঁচল দিয়া গেলাস ধরিয়া এক চুমুক চায়ের আস্বাদ লইয়া গেলাস হাতে উঠিয়া গেল।

রান্নাঘরের পাশের ঘরটিতে রতন থাকে। রতন গৃহ-স্বামীর ভাগিনেয়; বয়স ষোল কি সতেরো। বয়সের হিসাবে তাহার দেহের পরিপুষ্টি বেশী হইয়াছে—দীর্ঘাঙ্গ স্বাস্থ্যবান ছেলে। কিন্তু তাহার দেহের পরিণতি যে পরিমাণ হইয়াছে মনের পরিণতি সে পবিমাণ হয় নাই; বুদ্ধিও খুব ধারালো নয়। সে এখনও স্কুলে পড়ে। তাহাব গোলগাল, নূতন গুম্ফরেখাচিহ্নিত মুখ দেখিয়া মনে হয় তাহার দেহ তাহার মন বুদ্ধিকে অনেক দূর পিছনে ফেলিয়া আগাইয়া গিয়াছে।

রতন নিজের দোর গোড়ায় দাঁড়াইয়া দাঁতন করিতেছিল, শশী আসিয়া খাটো গলায় বলিল,—'দাদাবাবু, চা হয়েছে, মামাবাবু আর মামীমাকে দিয়ে এস গে।'

রতন চকিত হইয়া দাঁতন থামাইল। নূতন পরিস্থিতি অনুধাবন করিতে তাহার একটু সময় লাগিল, তারপর সে বলিল,—'কেন, তুমি দিয়ে এস না।'

শশী ফিক করিয়া হাসিয়া জিভ্ কাটিল,—'বাপ্‌রে, আমি কি ওঁদের ঘুম ভাঙাতে পারি! পাপ হবে যে।'

চোখ নাচাইয়া শশী চলিয়া গেল। রতন তাহার ইঙ্গিত কিছুই বুঝিল না, বিস্মিত হইয়া ভাবিল, ঘুম ভাঙাইলে পাপ হইবে কেন? যাহোক একটা কিছু করা দরকার। মামাবাবু প্রত্যহ চা তৈয়ার হইবার আগেই ওঠেন, আজ তাঁহার শয্যাত্যাগ করিতে দেরী হইয়াছে। অথচ চা ঠাণ্ডা হইয়া গেলেও তিনি বিরক্ত হন। রতন একটু ইতস্তত করিয়া মামাবাবুর

শয়নকক্ষের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ, কিন্তু বন্ধ দরজার ওপার হইতে যেন চাপা কথা ও হাসির গুঞ্জন আসিতেছে। আতপ্ত বিছানার ক্রোড় হইতে ভাসিয়া আসা মিহি-মোটা মেশানো অর্ধস্ফুট কাকলি কানে আসিল কিন্তু কথাগুলি সে স্পষ্টভাবে ধরিতে পারিলনা।

কিন্তু মামাবাবু জাগিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই ; রতন দ্বারে মৃদু টোকা দিয়া বলিল,—'মামাবাবু, চা তৈরি হয়েছে।'

ভিতরের কূজন ক্ষণকালের জন্য নীরব হইয়া আবার আরম্ভ হইল, তারপর মামাবাবুর উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—'নিয়ে আয় রতন।'

খুট করিয়া দরজার ছিট্‌কিনি খুলিয়া গেল, দরজা একটু ফাঁক হইল। ফাঁক দিয়া কাহাকেও দেখা গেল না, পাশের দিক হইতে একটি রমণীর বাহু বাহির হইয়া আসিল। শুভ্র নিটোল বাহু, প্রায় কাঁধ পর্যন্ত দেখা গেল ; শাড়ীর পাড় বা আঁচল তাহাকে কোথাও আবৃত করে নাই। বাহুটি রতনের হাত হইতে একটি পেয়ালা লইয়া ভিতরে অদৃশ্য হইয়া গেল, আবার ফিরিয়া আসিয়া দ্বিতীয় পেয়ালাটি লইয়া ধীরে ধীরে দ্বার ভেজাইয়া দিল।

রতন ক্ষণকাল অনড় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রথম সিগারেট খাওয়ার তীব্র উত্তেজনার সহিত যেমন মাথা ঘুরিয়া পেটের ভিতরটা গুলাইয়া উঠে, তেমনই রতনের শরীরের ভিতরটা যেন পাক দিয়া উঠিল, হঠাৎ শীত করার মত একটা রোমাঞ্চ তাহার গলায় বুকে বগলে ফুটিয়া উঠিল।

শশী ঝি কলতলায় বাসন মাজিতে আরম্ভ করিয়াছে। রতন ফিরিয়া গিয়া মুখে চোখে জল দিয়া রান্নাঘরের মেঝেয় উপু হইয়া চা খাইতে বসিল। সকাল বেলার এই চা'টি তাহার অতিশয় প্রিয় কিন্তু আজ এক-

চুমুক খাইয়া চা তাহার মুখে বিস্বাদ ঠেকিল। তাহার মনে হইল, অকস্মাৎ তাহার জীবনে একটা নূতন কিছু আবির্ভাবের ফলে সমস্তই যেন ওলট-পালট বে-বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে।

আর একটু আগে হইতে বলা দরকার।

বিয়াল্লিশ বছর বয়সে শশাঙ্কবাবু—অর্থাৎ মামাবাবু—দ্বিতীয় বিবাহ করিলেন। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর সাত বৎসর তিনি নিষ্কলঙ্ক নিষ্কাম জীবন যাপন করিয়াছিলেন, লোকে মনে করিয়াছিল তিনি আর বিবাহ করিবেন না। তিনি কলিকাতায় থাকিয়া ভাল চাকরি করেন; পাড়ায় মানসম্ভ্রমও আছে। শরীর বেশ তাজা ও মজবুৎ। নিজের সন্তানাদি না থাকায় প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর মাতৃ-পিতৃহীন ভাগিনেয় রতনকে নিজের কাছে আনিয়া রাখিয়া ছিলেন। কলিকাতার একটি ক্ষুদ্র বাড়ীতে তাঁহার জীবন-যাত্রা একরকম নিরুপদ্রবেই কাটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু বিয়াল্লিশ বছর বয়সে কেন জানিনা তাঁহার মনের গতি পরিবর্তিত হইল, তিনি আবার বিবাহ করিয়া নূতন বধূ ঘরে আনিলেন। পুন্নাম নরকের ভয়ে এই কার্য্য করিলেন কিংবা অন্য কোনও মনস্তত্ত্বঘটিত কারণ ছিল তাহা বলা শক্ত। শোনা যায়, এই বয়সটাতে নাকি যৌন প্রকৃতির নিবন্ত প্রদীপ একবার উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়া ওঠে।

বধূটির নাম শান্তি; বয়স উনিশ-কুড়ি। মুখচোখ তেমন ভাল না হইলেও গায়ের রং বেশ ফরসা। তন্বী নয় কিন্তু দীর্ঘাঙ্গী। রূপ যত না থাক, তাহার দেহে যৌবনের ঢলঢল প্রাচুর্যই তাহাকে কমনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। পুরন্ত বুক, পুরন্ত ঠোঁট; সারা দেহে যেন পূর্ণ যৌবনের শ্লথমন্থর মদালসতা। শশাঙ্কবাবু তাঁহার সাত বৎসরের সংযম জীর্ণ-বস্ত্রের মত ফেলিয়া দিয়া যৌবনের এই ভরা নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন।

রতনের মনের উপর এই বিবাহের প্রতিক্রিয়া প্রথমে কিছুই হয় নাই। সে শান্তশিষ্ট ভালমানুষ ছেলে, মামার সংসারে থাকিয়া পড়াশুনা করিত ও মাঝে মাঝে মামার দুই-চারিটা ফরমাস খাটিত। তাই, সংসারে দুইটী মানুষের স্থলে যখন তিনটি মানুষ হইল তখনও তাহার জীবনের ধারা আগের মতই রহিল। শান্তির মনটি ভাল, আসিয়াই স্বামীর গলগ্রহটীকে বিষচক্ষে দেখে নাই, বরং তাহাকে স্বামীগৃহের একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। শান্তির প্রকৃতি একটু মন্থর, আরামপ্রিয় ও আত্মকেন্দ্রিক, তবু বিবাহেব মাস দেড়েকের মধ্যে রতনের সহিত তাহার অল্প ভাব হইয়াছিল। রতন একে বয়সে কনিষ্ঠ, তার উপর সম্পর্কেও ছোট, শান্তি তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিত, মাঝে মাঝে ছোটখাট ফরমাস করিত। একদিন তাহাকে বলিয়াছিল,—'রতন, ইস্কুল থেকে ফেরবার সময় আমার জন্যে চকোলেট কিনে এনো তো।' রতন পরম আহ্লাদের সহিত চকোলেট্ আনিয়া দিয়াছিল।

তারপর একদিন ফাল্গুন মাসের সকাল বেলা রতনের অন্তর্জীবনে অকস্মাৎ কী এক বিপর্যয় হইয়া গেল; বারুদের অন্তর্নিহিত নিষ্ক্রিয় দাহিকাশক্তি আচম্‌কা আগুনের স্পর্শে প্রচণ্ডবেগে বিস্ফুরিত হইয়া উঠিল।

সেদিন স্কুলে গিয়াও রতনের মন সুস্থ হইল না, একটা অশান্ত উদ্বেগ শারীরিক পীড়ার মত তাহার দেহটাকে নিগৃহীত করিতে লাগিল; মাঝে মাঝে কান দুটো গরম হইয়া অসম্ভব রকম জ্বালা করিতে লাগিল। আর তাহার চোখের সামনে ভাসিতে লাগিল—একটি নিটোল শুভ্র নগ্ন বাহু···

পরদিন সকাল বেলা যখন চা তৈয়ার হইল, মামাবাবুর দরজা তখন খোলে নাই। শশী ঝি মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল,—'কাল আবার শনিবার গেছে, আজ কি আর এত শিগ্‌গির ঘুম ভাঙবে! যাও দাদাবাবু, ওঁদের চা দিয়ে এস।'

শশীর কথার মধ্যে কিসের যেন ইঙ্গিত আছে, না বুঝিলেও তাহা মনকে বিক্ষিপ্ত করিয়া তোলে। রতন চায়ের পেয়ালা দুটি হাতে লইয়া শশাঙ্কবাবুর দরজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল; দেখিল দরজা একটু আল্‌গা হইয়া আছে। সে একবার গলা ঝাড়া দিয়া ডাক দিল,—'চা এনেছি।'

ভিতর হইতে ঘুমজড়িত কণ্ঠস্বর আসিল,—'ভেতরে রেখে যাও রতন।'

রতনের বুকের ভিতরটা ধড়াস্‌ করিয়া উঠিল। সে পা দিয়া দরজা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরের বদ্ধ বাতাস সমস্ত রাত্রির নিশ্বাসের তাপে ঈষদুষ্ণ হইয়া আছে; সেণ্ট্‌-ক্রীম-কেশতৈল মিশ্রিত একটি সুগন্ধ তাহাকে যেন আরও ভারী করিয়া রাখিয়াছে। বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাস হইতে এই আবহাওয়ার মধ্যে প্রবেশ করিয়া রতনের স্নায়ুমণ্ডলী যেন কোন এক অনাস্বাদিত রসের আভাসে তীক্ষ্ণ সজাগ হইয়া উঠিল। তাহার বুকের ধড়্‌ফড়ানি আরও বাড়িয়া গেল।

বদ্ধ জানালার কাঁচের ভিতর দিয়া অল্প আলো আসিতেছিল। রতন শয্যার দিকে না তাকাইয়াও শয্যার খানিকটা দেখিতে পাইল······ঠুন্‌ করিয়া চুড়ির মৃদু আওয়াজ আসিল। রতন নিশ্বাস রোধ করিয়া ঘরের মাঝখানে একটি টেবিলের দিকে চলিল। টেবিলের উপর চায়ের পেয়ালা রাখিতে গিয়া সে দেখিল, শান্তির গলার হার, ব্লাউজ ও কাঁচুলি অবহেলা-ভরে সেখানে ছড়ানো রহিয়াছে। রতন হঠাৎ চোখ বুজিয়া পেয়ালা দুটি ঠক্‌ করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহার বুকের রক্ত তখন এমন তোলপাড় করিতেছে যে মনে হইতেছে হৃৎপিণ্ডটা বুঝি এখনি ফাটিয়া যাইবে।

কলতলায় গিয়া তপ্ত মুখখানা ধুইয়া ফেলিবার জন্য জলের চৌবাচ্চায় ঘটি ডুবাইতেই শশী বাসন মাজিতে মাজিতে মুখ তুলিয়া চাহিল; তাহার

মুখ দেখিয়া শশী অনিমেষে তাকাইয়া রহিল, তারপর চাপা হাসিয়া বলিল,—'ওমা, তোমার মুখ অমন রাঙা কেন, দাদাবাবু! কিছু দেখে ফেললে নাকি ?

রতন বিহ্বলভাবে বলিল,—'না না—'

বলিয়াই শশীর দিকে চাহিয়া সে স্তব্ধ হইয়া গেল। শশী বাসন মাজার প্রয়োজনে দুই বাহু হইতে কাপড় কাঁধ পর্য্যন্ত তুলিয়া দিয়াছিল, রতন দেখিল—সেই বাহু! নিকষের মত কালো বটে কিন্তু তেমনি নিটোল চিক্কণ সাবলীলতায় যেন ময়াল সাপের মত দুলিতেছে!

শশীর অভিজ্ঞ চক্ষু রতনের পরিবর্তন আগেই লক্ষ্য করিয়াছিল; সে বুঝিয়াছিল। নিজের দিকে আড়চোখে তাকাইয়া সে হাতের পোঁচা' দিয়া কাঁধের কাপড় একটু নামাইয়া দিল, চোখ নীচু করিয়া গদ্‌গদ স্বরে বলিল,—'দাদাবাবু, তুমি আর ছেলেমানুষটি নেই—বড় হয়েছ।'

রতন আর সেখানে দাঁড়াইল না, হাতের ঘটি ফেলিয়া দুড়্‌দুড়্‌ করিয়া ছাদে উঠিয়া গেল।

ছোট এক ফালি ছাদ, বুক পর্যন্ত পাঁচিল দিয়া ঘেরা। রতন গিয়া দক্ষিণ দিকের পাঁচিলে হাত রাখিয়া দাঁড়াইল। ফাল্গুন প্রভাতের গায়েকাঁটা-দেওয়া নরম হাওয়া তাহার উত্তপ্ত মুখে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। কিন্তু, ঐ হাওয়ার স্পর্শে কী ছিল, রতনের মন ঠাণ্ডা হইল না, বরং আরও অধীর উদ্বেল হইয়া উঠিল।

জীবনের এই সন্ধিকালটি সুখময় সময় নয়; নবলব্ধ এক দুর্দম হর্ষ-বেগের তাড়নায় শান্তি সৌম্যতা সব নষ্ট হইয়া যায়। যাহাদের জীবনে এই রিপুর অভিযান অকস্মাৎ আসে, নিরস্ত্র অভিজ্ঞতাহীন বয়সে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা মারাত্মক হইয়া ওঠে।

রতনের চোখে পৃথিবীর চেহারা বদলাইয়া গেল; যাহা এতদিন নিষ্কাম নিষ্কলুষ তপোভূমি ছিল তাহাই সাক্ষাৎ কামরূপী হইয়া দাঁড়াইল।

যেদিকে সে চক্ষু ফিরায় সেই দিকেই যেন কামের লীলা চলিতেছে। বাহ্ জগৎ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া মনের মধ্যে লুকাইয়াও রক্ষা নাই ; সেখানে কল্পনার ক্রিয়া এতই বাড়িয়া গিয়াছে যে বাস্তব জগৎ তাহার কাছে বর্ণ গরিমায় ম্লান হইয়া যায়,—একটি বাস্তব বাহু কল্পনা সৃষ্ট দেহের সংযুক্ত হইয়া দুর্দমনীয় উন্মাদনার কারণ হইয়া ওঠে।

রতন কল্পনাপ্রবণ ছেলে নয়, বরং বিপরীত ; কিন্তু তাহার কল্পনাতে ইন্ধন যোগাইবার মত যথেষ্ট উপকরণ বাড়ীতেই ছিল। বাঁধভাঙ্গা বন্যার প্রথম প্রবল উচ্ছ্বাস যেমন ক্রমশ প্রশমিত হয়, রতনের তরুণ জীবনে প্রবৃত্তির এই প্রথম প্লাবন হয়তো কালক্রমে শান্ত হইয়া স্বাভাবিক আকার ধারণ করিত, কিন্তু বাড়ীর রিরংসাসিক্ত আবহাওয়ায় তাহার সে সুযোগ মিলিল না। শশীর 'চলন-বলন' কটাক্ষ-ইঙ্গিত তো ছিলই, তাহার উপর নব পরিণীত মামা-মামীর আচরণ তাঁহাদের অজ্ঞাতসারেই রতনের পক্ষে সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছিল।

শশাঙ্কবাবু মধ্য বয়সে যৌবনবতী ভার্যা বিবাহ করিয়াছিলেন, হয়তো বয়সের বৈষম্যের জন্য তাঁহার অন্তরের গোপন কোণে একটু আত্ম-সংকোচ বা inferiority complex ছিল, তাহাই চাপা দিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার আচরণে একটু মৃদু রকম exhibitionism প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। প্রথম লজ্জা কাটিয়া যাইবার পর তিনি তাঁহার দাম্পত্য জীবনকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখিবার জন্য আর বিশেষ যত্নবান রহিলেন না। রতনকে হয়তো নেহাৎ ছেলেমানুষ মনে করিয়াই তিনি তাহার সম্মুখে সমস্ত সাবধানতা ত্যাগ করিলেন। শান্তি প্রথমটা সংকোচ করিত, কিন্তু তাহার লজ্জাও ক্রমে উদাসীনতায় শিথিল হইয়া পড়িল। একদিন রবিবার অপরাহ্ণে শশী কাজ করিতে আসিয়া চুপি চুপি রতনের ঘরে প্রবেশ করিল। রতন পড়ার টেবিলে বসিয়া কি একটা

করিতেছিল, শশী তাহার কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল,—'দাদাবাবু, মামা-মামীর ঘরের খবরটা একবার নিয়ে এলে না? সেখানে যে—' বলিয়া গলার মধ্যে হাসিয়া রতনের গায়ে ঢলিয়া পড়িল। রতন শিহরিয়া বলিল,—'কেন, কি হয়েছে?'

'মুখে আর কত বলব, নিজের চোখেই দেখে এস না, চোখ সার্থক হবে।' বলিয়া শশী সারা অঙ্গ হিল্লোলিত করিয়া হাসি চাপিতে চাপিতে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ মূঢ়ের মত বসিয়া থাকিয়া রতন আস্তে আস্তে উঠিয়া বাহিরে গেল। লম্বা বাবান্দার অন্য প্রান্তে মামাবাবুর ঘর। ঘরের দরজা খানিকটা ফাঁক হইয়া আছে, তাহার ভিতর দিয়া শয্যা দেখা যায়··· দুইজন আত্মবিস্মৃত নরনারী—তাহারা ছাড়া পৃথিবীতে যে আর কেহ আছে সে জ্ঞান তাহাদের নাই······

রতন ছুটিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল, বালিশে মুখ গুঁজিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল।

শশী কখন নিঃশব্দে আসিয়া তাহার বিছানায় বসিয়াছে সে জানিতে পারে নাই, গালের উপর শশীর করস্পর্শে চমকিয়া আরক্ত চোখ মেলিল। শশী তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া প্রায় গালের উপর মুখ রাখিয়া বলিল,—'কি হয়েছে দাদাবাবু? অমন করছ কেন?'

রতন কাঁপা গলায় বলিয়া উঠিল,—'কি হয়েছে—আমি জানিনা—'

শশী তেমনি ভাবে গালে গাল রাখিয়া বলিল,—'কি হয়েছে আমি বুঝিয়ে দেব।—এখন নয়; রাত্তিরে মামা-মামী ঘুমোলে চুপি চুপি উঠে সদর দরজা খুলে দিও। আমি আসব।—বুঝলে?'

দুই সপ্তাহ কাটিয়াছে।

প্রবল জ্বরের তাড়সে অঘোর অচৈতন্য হইয়া রতন বিছানায় পড়িয়া

ছিল। তাহার দেহ যেন কোন বিষের জ্বালায় পুড়িয়া যাইতেছে; সারা গায়ে চাকা চাকা রক্তবর্ণ দাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শশাঙ্কবাবু ডাক্তার ডাকাইলেন। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া শশাঙ্ক-বাবুকে আড়ালে ডাকিয়া যাহা বলিলেন তাহা শুনিয়া শশাঙ্কবাবু একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন, তারপর ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইযা উঠিলেন। নবপরিণীতা পত্নীর সম্মুখে তাঁহার বাড়িতে এমন কুৎসিত ব্যাপার ঘটিল, ইহাতে তাঁহার ক্রোধ আরও গগনস্পর্শী হইয়া উঠিল। কাঁপিতে কাঁপিতে রতনের ঘরে গিয়া তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন,—'বেরিয়ে যা এই দণ্ডে আমার বাড়ী থেকে, হতভাগা কুলাঙ্গার।'

রতন বিহ্বল ভাবে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল, তারপর অবরুদ্ধ স্বরে বলিল,—'মামাবাবু আমার জ্বর হয়েছে—'

'জ্বর হয়েছে! নচ্ছার পাপী কোথাকার।—যাও—এখনি বিদেয় হও। আমার বাড়ীতে ও পাপের বিষ ছড়াতে দেবনা।—উঃ, দুধকলা খাইয়ে আমি কালসাপ পুষেছিলুম—' রতন টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, দেয়াল ধরিযা ধরিয়া স্খলিতপদে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।···রাস্তায় লোকজনের ব্যস্ত যাতায়াত······পৃথিবীটা কোন্ যাদুকরের মন্ত্রবলে লাল হইয়া গিয়াছে···রক্তাভ কুয়াসার ভিতর দিয়া রাক্ষসের মত একটা মিলিটারী লরী ছুটিয়া আসিতেছে—রতন ফুটপাথ হইতে নামিয়া তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল···

রতনের মৃত্যুটা অপঘাত কিংবা আত্মহত্যা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়না।

চুরি

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে কলিকাতা সহরে এখানে ওখানে গুটিকয়েক লোন্-অফিস ছিল, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর তাহাদের সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে। লোন্ অফিসের মহাজনী কারবার অতি সরল ও সহজ। অভাবগ্রস্ত মানুষ নিজের অস্থাবর সম্পত্তি—ঘটি বাটি ঘড়ি কলম আনিয়া বন্ধক রাখিয়া টাকা লয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই টাকা শোধ হয় না, সুদের মেয়াদ ফুরাইলে বন্ধকী মাল লোন্ অফিসের সম্পত্তি হইয়া যায়। তখন তাহারা ঐ মাল নিজেদের শো-কেসে সাজাইয়া রাখে এবং সন্ধানী খরিদ্দারের নিকট লাভে বিক্রয় করে।

নগেন যুদ্ধের মরশুমে একটি লোন্-অফিস খুলিয়া বেশ গুছাইয়া লইয়াছিল। দেশে অভাবগ্রস্ত মানুষের কোনও দিনই অভাব নাই, তাহার উপর শাদা-কালো বহুজাতীয় সৈনিকের শুভাগমনে নগেনের ব্যবসা জাপানী খেল্না-বেলুনের মত অতি সহজেই ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়াছিল। বীর যোদ্ধগণের দৈহিক ক্ষুধা-তৃষ্ণা যখন দুর্নিবার হইয়া ওঠে তখন তাঁহারা বন্ধক রাখিতে পারেন না এমন জিনিস নাই।

নগেনের বয়স বেশী নয়, ত্রিশের নীচেই। সদ্‌বংশে জন্মিবার ফলে সে কয়েকটি নৈতিক সংস্কার লইয়া জন্মিয়াছিল, যদিও অর্থোপার্জনের সদসৎ উপায় সম্বন্ধে বাঙালী ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও নৈতিক সংস্কারই নাই। জুতা সেলাই হইতে চণ্ডী-পাঠ পর্য্যন্ত সব কাজই আমরা নিন্দাভাজন না হইয়া করিতে পারি যদি তাহাতে অর্থলাভ হয়। এই জন্যই বোধ হয় দারোগা হওয়ার আশীর্বাদকে আমরা নিছক পরিহাস

বলিয়া গ্রহণ করিনা এবং কালো-বাজারের কালীয় নাগদের প্রতি আমাদের বিদ্বেষও তেমন মারাত্মক হইয়া উঠিতে পারে নাই।

কিন্তু এসব অবান্তর কথা থাক। নগেনের সাফল্য মণ্ডিত বাহ্য জীবন হইতে তাহার অন্তর্জীবনে যেবস্তু প্রবেশ করিয়াছিল তাহার কথাই বলিব। তৎপূর্বে আর একটি কথা বলিয়া লওয়া প্রয়োজন; ইহাও অবশ্য নগেনের অন্তর্লোকের কথা এবং অতিশয় গুহ্য।

বয়স ত্রিশের কাছাকাছি হইলেও নগেন স্বাস্থ্যবান যুবক, তাহার রক্তের তাপ এখনও কমিতে আরম্ভ করে নাই। কিন্তু তাহার স্ত্রী ক্ষণিকা—সংক্ষেপে ক্ষণা—মাত্র তেইশ বছর বয়সেই তাহার ক্ষণযৌবনকে বিদায় দিয়াছিল। শুধু দেহের দিক দিয়া নয়, মনের দিক দিয়াও। ক্ষণা দেখিতে মন্দ নয়, নবযৌবনের আবির্ভাবে তাহার দেহে একটি শান্ত শ্রী দেখা দিয়াছিল; কিন্তু উপর্যুপরি দুইটি মৃত সন্তান প্রসব করিবার পর, তাহার দেহলাবণ্য তো গিয়াছিলই, নারীত্বও যেন হঠাৎ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। যাহা রহিয়া গিয়াছিল তাহা গৃহকর্ম্মনিপুণ সচল সবাক একটি যন্ত্র মাত্র।

নগেন চরিত্রবান যুবক কিন্তু সহজ স্বাস্থ্যবান পুরুষের ক্ষুধাতৃষ্ণা তাহার ছিল। তাই তাহার দাম্পত্য জীবনের এই অপ্রত্যাশিত অনাবৃষ্টি তাহার অন্তরের কাঁচা ফসলকে শুকাইয়া তুলিতেছিল। খাল কাটিয়া জলসিঞ্চনের কথা তাহার মনেই আসে না—তাহার মন সে ছাঁচে গঠিত নয় কিন্তু বঞ্চিত ব্যর্থ-যৌবনের ক্ষোভ তাহার নিভৃত অন্তরে সঞ্চিত হইয়া কোনও অনর্থের সৃষ্টি করিতেছিল কিনা তাহা কেবল বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরাই বলিতে পারেন।

হয়তো আমার এই কাহিনীর সহিত নগেনের নিরুদ্ধ ক্ষোভের কোনও সম্বন্ধ নাই। কিম্বা—কে বলিতে পারে!

১৯৪২ সালের শেষের দিকে কলিকাতা সহরে নানা বিজাতীয় সৈনিকের আবির্ভাবে তিল ফেলিবার ঠাঁই ছিলনা ; এমন বিভিন্ন বর্ণের ও বিভিন্ন আকৃতির মানুষ একই স্থানে সমবেত হইতে পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই। এই সময়ে নগেনের লোন্ অফিসে একটি লোক আসিল। মিলিটারী পোষাক পরা লম্বা জোয়ান ; মাথার চুল কাফ্রির মত কোঁকড়ানো, গায়ের রং নারিকেল ছোব্ড়ার ন্যায়, চোখের মণি নীল। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলিল,—'আমি একটা জিনিষ বন্ধক রেখে টাকা চাই।'

সে পকেট হইতে একটি ছুরি বাহির করিল। ছুরি না বলিয়া ছোরা বলিলেই ভাল হয়, যদিও পেন্সিল-কাটা ছুরির মত উহা ভাঁজ করিয়া বন্ধ করা যায়। হাড়ের বাঁট দীর্ঘকালের ব্যবহারে ও তামাকের রসে বাদামী হইয়া গিয়াছে কিন্তু ফলাটা সতেজ উগ্রতায় ঝকঝক করিতেছে। ফলাটা প্রায় ছয় ইঞ্চি লম্বা, কিন্তু এমন অদ্ভুত তাহার গঠন যে দেখিলেই চমকিয়া উঠিতে হয়। নগেন সম্মোহিতের মত দেখিতে লাগিল। ছুরিটা যেন ছুরি নয়, বৃশ্চিকের মত ক্রূর জীবন্ত একটা প্রাণী ; তাহার ফলাটা বন্য পশুর দন্ত নিষ্কাশনের মত বর্বরোচিত হিংস্রতায় হাসিতেছে।

ছুরি হইতে চোখ তুলিয়া নগেন দেখিল, ছুরির মালিকও পোকায়-খাওয়া ঘষা দাঁত বাহির করিয়া ব্যঙ্গভরে হাসিতেছে। নগেনের ব্যবসাবুদ্ধি ফিরিয়া আসিল, সে ছুরিটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া বলিল,—'তিন টাকা দিতে পারি।'

ছুরির মালিক বলিল,—'আমার পাঁচ টাকা চাই।'

নগেন আর দ্বিরুক্তি না করিয়া রসিদ্ লিখিয়া তাহাকে পাঁচ টাকা দিল। সাত দিনের মেয়াদ, ইহার মধ্যে টাকা শোধ না করিতে পারিলে

ছুরি বাজেয়াপ্ত হইযা যাইবে। লোকটা রসিদ ও টাকা প্যাণ্টুলনের পকেটে পুরিয়া বলিল,—'ছুরি সাবধানে রেখো, আমার বড় আদরের জিনিষ। শিগ্‌গিরই আমি খালাস করে নিয়ে যাব।'

লোকটা কেমন একরকম ভাবে নগেনের দিকে তাকাইয়া একটু নড করিয়া চলিয়া গেল। নগেন কিছুক্ষণ দ্বারের পানে চাহিয়া রহিল। অদ্ভুত চেহারা লোকটার! কাফ্রির মত চুল, শাদা আদমির মত চোখ, এসিয়াবাসীর মত রঙ। যেন তিনটি মহাদেশেব তিনজন মানুষকে একত্র করিয়া একটি মানুষ তৈয়ার হইয়াছে। কিম্বা ঐ একটা মানুষ হইতেই তিন মহাদেশের তিনটি জাতি বাহির হইয়া আসিয়াছে। লোকটার বয়স অনুমান করা যায় না; ত্রিশ বছরও হইতে পারে, আবার তিন হাজার বছর বলিলেও অসম্ভব মনে হয় না।

ছুরিটা টেবিলের উপর ছিল, সেটা তুলিয়া লইয়া নগেন আবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। কি ধার! নগেন ছুরির ফলাটা নিজের রোমশ বাহুর উপর দিয়া একবার ক্ষুরের মত টানিয়া লইয়া গেল, লোমগুলি ঝরিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে একটা অপূর্ব হর্ষ তাহার দেহকে কণ্টকিত করিয়া তুলিল। অনুভূতির প্রকৃতিটা অজানা নয়, কিন্তু আরও তীব্র আরও কুটিল—পরকীয়া প্রীতির মত গোপন অপরাধের বিষ মেশানো।

সেদিন সমস্ত কাজকর্ম্মের মধ্যে নগেনের মন ঐ ছুরির দিকেই পড়িয়া রহিল। তাহার মনে হইল, লোকটা যদি ছুরি উদ্ধার করিতে না আসে তো বেশ হয়। ছুরিটা তাহার হইয়া যাইবে; সে আর কাহাকেও বিক্রয় করিবেনা।

ব্ল্যাক-আউটের কল্যাণে সন্ধ্যার সময়েই দোকান বন্ধ করিতে হয়। নগেন ছুরিটি সাবধানে সিন্দুকে বন্ধ করিয়া দোকানে তালা লাগাইয়া বাড়ী

ফিরিল। কিছুদিন যাবৎ তাহার মনটা কেমন যেন নিঃসম্বল হইয়া ছিল, আজ তাহার মনে হইল সে হঠাৎ গুপ্তধন পাইয়াছে।

বাড়ী ফিরিয়া সে ক্ষণাকে ছুরির কথা বলিল না, দু'একবার বলি-বলি করিয়া থামিয়া গেল। ছুরিটা ব্যবহারিক জগতে এমন কিছু মহার্ঘ বস্তু নয়; তাছাড়া, নগেন নিজের মনের মধ্যে যে নূতন গুপ্তধন পাইয়াছে, ক্ষণাকে তাহার ভাগ দিতে রাজি নয়। একদিন ছিল যখন তাহারা মনের তুচ্ছতম অনুভূতিও আদানপ্রদান করিয়া সুখী হইত, কিন্তু এখন আর সেদিন নাই।

রাত্রিব আহারাদি শেষ করিয়া নগেন শয়ন করিতে গেল। স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি ঘরে শয়ন করে, বছরখানেক হইতে এই ব্যবস্থাই চলিতেছে। বিছানায় শুইয়া কিছুক্ষণ বই পড়া নগেনের অভ্যাস, কিন্তু আজ আর বই পড়িতে ইচ্ছা হইল না। আলো নিভাইয়া সে শুইয়া পড়িল।

ঘুমাইয়া নগেন স্বপ্ন দেখিল, ছুরির মালিক হাতে ছুরি লইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছে, তাহার নীল চোখে উৎকট উল্লাস……কতকগুলা নগ্ন নধর মনুষ্যদেহ তাহার চারিপাশে তাল পাকাইতেছে; লোকটা হাসিতে হাসিতে তাহাদের দেহে ছুরি মারিতেছে। কিন্তু ইহা হত্যার লীলা নয়, ভোগের ক্রীড়া। কি সহজে ছুরি ঐ নগ্ন জীবন্ত মাংসের মধ্যে আমূল প্রবেশ করিতেছে আর রক্তাক্ত মুখে বাহির হইয়া আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে নগেনের শরীর উদ্দীপনায় আনচান্ করিতে লাগিল। নরম মাংসের উপর ছুরির ঐ পুনঃপুন আঘাত তাহার ধমনীর রক্তে যেন আগুন ধরাইয়া দিল।

তীব্র উত্তেজনায় তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। এমন তীব্র উত্তেজনা সে অনেকদিন অনুভব করে নাই; তাহার দেহের ত্বক উত্তপ্ত হইয়া জ্বালা

করিতেছে। সে কিছুক্ষণ বিছানায় বসিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে নামিল, অন্ধকারে হাৎড়াইয়া পাশের ঘরে ক্ষণার শয্যার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণা ঘুমাইতেছে, ঘুমের মধ্যে একটা বিশ্রী শব্দ করিয়া তাহার নিশ্বাস পড়িতেছে। শয্যায় প্রবেশ করিতে গিয়া নরেন সরিয়া আসিল; শয্যার চারিদিকের বাতাস ক্ষণার নিশ্বাসের দূষিত বাষ্পে ভারী হইয়া উঠিয়াছে। একটা দৈহিক বিকর্ষণ নগেনের শরীরের মধ্যে বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। সে ফিরিয়া গিয়া এক গ্লাস জল পান করিয়া নিজের শয্যায় শুইয়া পড়িল।

পরদিন দোকানে গিয়া প্রথমেই নগেন সিন্দুক খুলিয়া ছুরির খবর লইল, ছুরি সিন্দুকের অন্ধকারের ভিতর হইতে চিকমিক করিয়া যেন তাহাকে অভিবাদন করিল। আশ্চর্য্য, ছুরিটা যেন কথা কয়। ফলা খুলিয়া বাঁটটা শক্ত করিয়া মুঠিতে ধরিতেই সে যেন সোল্লাসে বলিয়া উঠিল,—এই তো! এম্নি ক'রে আমায় ধরতে হয়। এবার কোথাও বিঁধিয়ে দাও—! নরম জীবন্ত মাংস নেই? আমার কাজই তো নরম মাংসের মধ্যে বিঁধে যাওয়া—!

ঘরের কোণে একটা উঁচু টুলের উপর একটি মখমলের মোটা তাকিয়া রাখা ছিল; কেহ বাঁধা দিয়া গিয়াছে। নগেনের দৃষ্টি পড়িল সেটার উপর। ঘরে তখন অন্য মানুষ নাই; নগেন ছুরি পিছনে লুকাইয়া তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, তারপর সহসা ছুরি তুলিয়া সজোরে তাকিয়ার মধ্যে বসাইয়া দিল। একবার—দু'বার—তিনবার—দ্রুত পরম্পরায় আঘাত করিতে করিতে নগেন যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিল; তারপর আবার অকস্মাৎ তাহার রক্ত ঠাণ্ডা হইয়া গেল, অবসাদে মুষ্টি শিথিল হইয়া পড়িল। না, এ যেন দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইবার চেষ্টা; মখমলের তাকিয়া নরম বটে কিন্তু রক্তমাংসের আস্বাদ তাহাতে নাই।

ছুরিটি সস্নেহে সিন্দুকে রাখিয়া দিয়া নগেন সমস্ত দিন লোন্ অফিসের কাজকর্ম করিল, কিন্তু তাহার মন একদণ্ডের তরেও নিরুদ্বেগ হইলনা; প্রত্যেকটি নূতন খদ্দের তাহার দ্বার দিয়া প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুকের ভিতরটা চম্‌কাইয়া ওঠে—ঐ বুঝি সেই লোকটা ছুরি ফিরাইয়া লইতে আসিল! লোকটা অবশ্য আসিল না; কিন্তু মাত্র পাঁচ টাকায় ছুরি বাঁধা রাখার জন্য তাহার অনুতাপ হইতে লাগিল, দশ টাকা কিংবা পনেরো টাকা দিলেই ভাল হইত, তাহা হইলে লোকটা সহজে ছুরি উদ্ধার করিতে পারিত না!

সন্ধ্যা হইতে না হইতে নগেন তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করিয়া ফেলিল, কি জানি লোকটা যদি আসিয়াই পড়ে! উপরন্তু ছুরিটা দোকানে রাখিয়া বাড়ী ফিরিতেও তাহার মন সরিল না। দোকানে রাত্রে কেহ থাকেনা; যদি চোর ঢোকে? দিন কাল ভাল নয়; নগেন ছুরিটা পকেটে পুরিয়া লইল।

শীতের সন্ধ্যায় আকাশে মেঘ জমিযা একেবারে অন্ধকার হইয়া গিযাছিল, গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল। কলিকাতা সহরের আলো পর্দা-নশীন হইয়া ঘবের মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছে, বাহিরে এক ফোঁটা আসিবার অধিকার নাই। সুতরাং পথ দিয়া যে দু'একজন যাতায়াত করিতেছে তাহাদের অস্তিত্ব কেবল পদশব্দে অনুমান করা যায়। নগেনের অবশ্য বাড়ী বেশীদূর নয়, দশ মিনিটের রাস্তা; তার উপর পথও একান্ত পরিচিত। তবু নগেন সাবধানে হাঁটিতে লাগিল।

তিন চার মিনিট হাঁটিবার পর তাহার মনে হইল, কে যেন তাহার পিছু লইয়াছে, পিছনে খস্‌খস্ শব্দ হইতেছে। সে সতর্ক হইয়া ঘাড় ফিরাইল, কিন্তু অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইল না। পকেটে ছুরিটা

শক্ত করিয়া ধরিয়া সে আরও দ্রুত পা চালাইল। পথ ঘাট নিরাপদ নয়, এই ব্ল্যাক-আউটের রাত্রে ঘাড়ের উপর গুণ্ডা লাফাইয়া পড়িলে মা বলিতেও নাই বাপ বলিতেও নাই।

পিছনে পায়ের শব্দ কিন্তু থামিল না, বরং আরও কাছে আসিয়াছে মনে হইল। নগেন চলিতে চলিতে ছুরিটা বাহির করিয়া ফলা খুলিয়া শক্তভাবে মুঠিতে ধরিল, তারপর হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কড়া স্বরে বলিয়া উঠিল—'কে?'

পিছনে পদশব্দ খুব কাছে আসিয়া থামিয়া গিয়াছিল; নগেন কিন্তু কোনও মানুষ দেখিতে পাইলনা। কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর তাহার মনে হইল, নীচে ফুটপাথের কাছে শাদা রঙের কী যেন একটা নড়িতেছে। সে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল; ক্রমশ ঐ শাদা বস্তুটা আকার ধারণ করিল। একটা শাদা কুকুর। নিতান্তই পথের কুকুর নির্জন পথে মানুষ দেখিয়া খাদ্যের আশায় তাহার সঙ্গ লইয়াছে।

নগেনের ঘনঘন নিশ্বাস পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, কুকুর বুঝিতে পারিয়া তাহার ভয় কমিল। শক্ত মুঠিতে ধরা ছুরিটা সে মুড়িয়া আবার পকেটে রাখিবার উপক্রম করিল।

কুকুরটা অস্পষ্টভাবে কুঁই কুঁই শব্দ করিতেছে, ফুটপাথের উপর পেট রাখিয়া সশঙ্কভাবে একটু একটু ল্যাজ নাড়িতেছে। নগেনের দুই চক্ষু হঠাৎ অন্ধকারে জ্বলিয়া উঠিল। সে সন্তর্পণে আবার ছুরির ফলা খুলিল; তাহার শরীরের মধ্যে রক্তের স্রোত প্রবল হর্ষোন্মাদনায় তোলপাড় করিয়া ছুটিতে লাগিল।

হাঁটু মুড়িয়া নগেন ফুটপাতের উপর অর্ধ-আনত হইয়া মুখে চুক্ চুক্ শব্দ করিল; কুকুরটা উৎসাহ পাইয়া প্রবল বেগে ল্যাজ নাড়িতে নাড়িতে

হামাগুড়ি দিয়া তাহার কাছে আসিল। মানুষের কাছে এতখানি সমাদর সে কখনও পায় নাই।

হাতের নাগালের মধ্যে আসিতেই নগেন বিদ্যুদ্বেগে ছুরি চালাইল। 'ঘেউ' করিয়া একটা আর্ত চীৎকার—কুকুরটা বেশী দূর পালাইতে পারিলনা, দু'পা সরিয়া গিয়া কাৎ হইয়া পড়িয়া গেল—

নগেন যখন বাড়ী পৌছিল তখন তৃপ্তি ও ক্লান্তিতে তাহার শরীর ভরিয়া উঠিতেছে। একটু হাসিয়া ক্ষণাকে বলিল,—'ক্লান্ত বোধ হচ্চে, আজ বড় খাটুনি গেছে। একটু শুয়ে থাকি গে, খাবার হ'লে ডেকো।'

লুকাইয়া ছুরিটাকে ধুইয়া নগেন উহা বালিসের তলায় রাখিয়া দিল, তারপর নিশ্চিন্ততার নিশ্বাস ফেলিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। আঃ, কী আরাম! তাহার দেহ মনে কোথাও এতটুকু অতৃপ্তি নাই।

পরের দিনটা একরকম নেশার ঝোঁকে কাটিয়া গেল। সকালে লোন অফিসে যাইবার পথে সে দেখিল, কুকুরটা ফুটপাথে মরিয়া পড়িয়া আছে, তাহার পাঁজরার সূক্ষ্ম কাটা দাগ হইতে রক্ত গড়াইয়া আছে। পথচারীরা তাহার সম্বন্ধে কোনই ঔৎসুক্য দেখাইতেছে না, পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছে। নগেনও মৃতদেহটা সম্বন্ধে কোনও ঔৎসুক্য অনুভব করিল না।

লোন্ অফিসে সমস্ত দিনটা আশঙ্কায় আশঙ্কায় কাটিল, কিন্তু সে লোকটা ছুরি উদ্ধার করিতে আসিল না। ছুরিটা আজ আর নগেন সিন্দুকে রাখে নাই, নিজের কোটের বুক-পকেটে রাখিয়াছিল। বুকের কাছে তার স্পর্শটাও যেন পরম তৃপ্তিকর।

সন্ধ্যার সময় দোকান বন্ধ করিয়া সে বাড়ী ফিরিল। আজ আর পথে কোনও ব্যাপার ঘটিল না। বাড়ী আসিয়া যথাসময় আহারাদি করিয়া সে শুইয়া পড়িল। এই কয়দিনে ক্ষণার সহিত তাহার সম্বন্ধ যেন আরও

শিথিল হইয়া গিয়াছে, নেহাৎ প্রয়োজন না হইলে কথা কহিতেও ইচ্ছা হয় না। ক্ষণার মনও তাহার সম্বন্ধে এতই নিরুৎসুক যে, স্বামীর জীবনে যে প্রকাণ্ড এক নূতন বস্তুর আবির্ভাব হইয়াছে তাহা সে অনুভবেও জানিতে পারে নাই।

গভীর রাত্রে নগেনের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে অনুভব করিল, ছুরিটা বালিসের তলায় থাকিয়া কথা কহিতেছে,—ছি ছি, এমন রাত্রিটা ঘুমিয়ে কাটালে! ভোগের শুভক্ষণ জীবনে ক'বার আসে? আমি আর কতদিন থাকব তোমার কাছে? কালই হয়তো আমার মালিক এসে আমাকে নিয়ে যাবে। ওঠ, ওঠ, এখনও সময় আছে—অন্ধকার নিরালা সহরে কত ছুটোছাটা শিকার ঘুরে বেড়াচ্ছে—কত লোক ফুটপাথে শুয়ে আছে—

নগেন বিছানায় উঠিয়া বসিল। ছুরিটা বালিসের তলা হইতে বাহির করিতেই তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া তীব্র উত্তেজনার একটা শিহরণ বহিয়া গেল। সে শয্যা হইতে নামিয়া কোট পরিয়া গায়ে একটা র‍্যাপার জড়াইয়া লইল।

বাহিরে যাইতে হইলে ক্ষণার ঘর দিয়া যাইতে হয়, স্বতন্ত্র দ্বার নাই। নগেন নিঃশব্দ পদে ক্ষণার ঘরে গিয়া দেখিল, ক্ষণা লেপ গায়ে দিয়া ঘুমাইতেছে, তাহার মুখ দরজার দিকে। নিশ্বাস চাপিয়া নগেন দ্বারের দিকে গেল, কিন্তু হুড়কা খুলিতে গিয়া খুট করিয়া একটু শব্দ হইয়া গেল।

চমকিয়া জাগিয়া ক্ষণা বলিয়া উঠিল,—'কে?'

ঘরের কোণে তেলের রাত্রি-দীপ তখনও নিভিয়া যায় নাই, ক্ষণা ঘাড় তুলিয়া নগেনকে দেখিয়া বলিল,—'ও—তুমি।' বলিয়া আবার চোখ বুজিল।

নগেনের বুকের ভিতরটা ধক্ ধক্ করিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ক্ষণা যখন কিছু সন্দেহ না করিয়া নিশ্চিন্তভাবে চক্ষু মুদিল, তখন নগেন বেশ শব্দ

করিয়া বাহিরে গেল। বাহিরের খোলা বারান্দায় দাঁড়াইয়া সে ক্ষণেক চিন্তা করিল, আর যাওয়া চলিবে না—ক্ষণা জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহার বুকের মধ্যে অতৃপ্ত কামনা গুমরিয়া গুমরিয়া গর্জন করিতে লাগিল; ছুরিটাও যেন তাহার বদ্ধ মুষ্টির মধ্যে ফোঁস ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। নগেন ফিরিয়া গিয়া সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া নিজের বিছানায় শয়ন করিল।

পরদিনটা নগেনের অসহ্য মানসিক অস্থিরতার মধ্যে কাটিল। কিছুই ভাল লাগে না, কোনও কাজেই মন নাই; দিন যেন কাটে না। থাকিয়া থাকিয়া একটা দুর্দম আকাঙ্ক্ষা বুকের মধ্যে সাপের মত 'ফণা' তুলিয়া উঠিতে থাকে। এই ভাবে দিন কাটিবার পর নগেন বাড়ী ফিরিল, আহারে বসিয়া ক্ষণাকে বলিল,—'শোবার ঘরের দরজায় হুড়্‌কো লাগাবার কী দরকার? বাড়ী তো বন্ধই থাকে। কাল মিছিমিছি তোমার ঘুম ভেঙে গেল।'

ক্ষণা সরল মনে বলিল,—'বেশ, আজ থেকে দরজা ভেজিয়ে রাখব।'

রাত্রি ঠিক বারোটার সময় নগেন বিড়ালের মত নিঃশব্দপদে বাড়ী হইতে বাহির হইল। আজ আর ক্ষণা জাগিল না।

বাহিরে তখন নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের কম্বল মুড়ি দিয়া কলিকাতা সহর ঘুমাইতেছে। আকাশের তারাগুলা নগেনের মাথার আরও কাছে নামিয়া আসিয়া তাহার হাতের ছুরির মতই নিষ্ঠুর হাসিতে লাগিল। নগেন নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত করিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করিল, তারপর ক্ষুধার্ত শ্বাপদের মত এই অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

পরদিন সকালবেলা খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে নগেন দেখিল, স্টপ প্রেসে ছাপা হইয়াছে—গত রাত্রে কলিকাতার অমুক গলিতে এক-

ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে ; মৃতদেহে ছয় সাতটি ছুরিকাঘাতের চিহ্ন ছিল। হত্যার কারণ বা হত্যাকারীর কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

সংবাদ পাঠ করিয়াও নগেনের মনের ভিতরটা প্রশান্ত নিস্তরঙ্গ হইয়া রহিল, এতটুকু চাঞ্চল্য সেখানে দেখা দিল না। কেবল একটি বিষয়ে তাহার মন সতর্ক হইয়া রহিল—কেহ জানিতে না পারে।

সে-রাত্রিটা গভীর স্বপ্নহীন নিদ্রায় কাটিল। বাঘ মহিষ মারিয়া আকণ্ঠ উদর পূর্ণ করিবার পর যেমন ঘুমায়, তেমনি আলস্যভারাক্রান্ত জড়ত্বভরা ঘুম নগেন ঘুমাইল।

কিন্তু পরদিন আবার তাহার ক্ষুধা জাগিয়া উঠিল। দুপুর রাত্রে আবার সে বাহির হইল।

আবার খবরের কাগজে বাহির হইল, রাস্তায় ছুরিকাহত একটি মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এ লইয়া বিশেষ হৈ চৈ হইল না, সারা পৃথিবী জুড়িয়া হত্যার যে মত্ত তাণ্ডব চলিয়াছে তাহাতে এই সামান্য একটা মানুষের মৃত্যু কাহাকেও উত্তেজিত করিতে পারিল না।

এইভাবে সাত দিনের মেয়াদ ফুরাইল। প্রায় প্রত্যহই একটি করিয়া বলি পড়িল।

সপ্তম দিনে দোকানে যাইতে যাইতে নগেন মনে মনে মৎলব করিল, আজ যদি লোকটা ছুরি উদ্ধার করিতে আসে, সে বলিবে ছুরি হারাইয়া গিয়াছে, তোমার যত ইচ্ছা দাম লও। ছুরি সে কিছুতেই ফেরৎ দিবে না।

কিন্তু লোকটা আসিল না। সন্ধ্যা পাঁচটা পর্য্যন্ত দেখিয়া নগেন তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করিয়া ফেলিল, তারপর ছুরি পকেটে লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। তাহার যেন আনন্দ আর ধরিতেছে না—ছুরি এখন

তাহার। আর ফেরত দিতে হইবে না। সে অনেকক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইল, তারপর অন্ধকার হইলে বাড়ী ফিরিল।

নিজের শয়ন ঘরের নির্জনতায় নগেন ছুরিটি খুলিয়া পরম স্নেহে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। কী সুন্দর জিনিষ। এমন অপূর্ব বস্তু পৃথিবীতে আর আছে কি? ছুরিটিকে সে নিজের বুকে গলায় গালে স্পর্শ করিল। তাহার দেহ আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তারপর হঠাৎ ঘরের বাহিরে ক্ষণার সাড়া পাইয়া সে ক্ষিপ্রহস্তে ছুরি বালিশের তলায় লুকাইয়া ফেলিল্।

সে-রাত্রে ঠিক বারোটার সময় তাহার ঘুম ভাঙিল; ছুরি·যেন· খোঁচা দিয়া ঘুম ভাঙাইয়া দিল। নগেন সম্পূর্ণ সজাগ হইয়া উঠিয়া বসিল; ভিতর হইতে তাগিদ আসিয়াছে, আজও বাহির হইতে হইবে। আজ ছুরিটি প্রথম তাহার নিজস্ব হইয়াছে, আজিকার রাত্রি বৃথা না যায়।

ক্ষণার ঘর দিয়া যাইবার সময় ক্ষণার শয্যার দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। দ্বারের দিকে যাইতে যাইতে সে থামিয়া গেল। ঈষদালোকিত ঘরে বিছানাটা অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে……চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে, তেমনি বিছানাটা নগেনকে টানিতে লাগিল। নগেন সতর্কভাবে শয্যার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল…ক্ষণাকে দেখা যাইতেছে, তাহার গায়ের লেপ সরিয়া গিয়াছে; ঘুমের মধ্যে তাহার দেহটা বিকলাঙ্গের মত অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়াছে, খোলা মুখ দিয়া সশব্দে নিশ্বাসপ্রশ্বাস বহিতেছে।

বিরাগ ও ঘৃণায় নগেনের মুখ বিকৃত হইয়া উঠিল। এই বীভৎস বিকলাঙ্গ মূর্তিটা তাহার স্ত্রী! ইহাকেই লইয়া সে জীবন কাটাইতেছে! ছুরিটা ফিস্ ফিস্ করিয়া তাহার কানে বলিতে লাগিল—বাইরে যাবার

দরকার কি ? একেই শেষ করে দাও। এই তো সুযোগ। দ্বিধা করছ ? ছি ছি, সারা জীবন ধরে এই মড়া ঘাড়ে করে বেড়াবে ! নাও নাও, আমি তো রয়েছি, বসিয়ে দাও ওর বুকে। জীবনের রঙ্ বদলে যাবে তোমার—আবার বিয়ে করতে পারবে—নতুন বৌ—

শুনিতে শুনিতে নগেন পাগল হইয়া গেল। তারপর কয়েক-মিনিটের কথা তাহার মনে নাই, যখন মাথাটা পরিষ্কার হইল তখন সে দেখিল, বিছানার উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া সে ক্ষণার বুকের উপর ছুরি বসাইতেছে। ক্ষণা একটু নড়েও নাই, যেমন শুইয়াছিল তেমনি মরিয়াছে।

সমগ্র চেতনা ফিরিয়া পাইয়া নগেন সভয়ে একবার ঘরের চারিদিকে তাকাইল, তারপর খাট হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। পাগল হইয়া এ কী করিল সে ! নিজের ঘরে খুন করিল ! এখন লাস সরাইবে কি করিয়া ? পাড়ায় জানাজানি হইবে। পুলিস আসিবে। পুলিস নিশ্চয় বাড়ী খানাতল্লাস করিবে—তখন ছুরি বাহির হইবে।

মেঝেয় বসিয়া পড়িয়া তুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া নগেন ভাবিতে লাগিল···ছুরিটা রক্তলিপ্ত অধরে তাহার কানে কানে কথা বলিতে লাগিল।—

পাঁচ মিনিট পরে নগেন তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আছে—উপায় আছে। সে ক্ষণার হাত হইতে সোনার চুড়িগুলি খুলিয়া লইল, গলা হইতে হার টানিয়া ছিঁড়িয়া পকেটে পুরিল। তারপর নিঃশব্দে বাড়ী হইতে বাহির হইল। ছুরি ও গহনাগুলা সে লোন-অফিসে লুকাইয়া রাখিয়া আসিবে। তারপর—

অবয়বহীন ছায়ার মত সে পথ দিয়া ছুটিয়া চলিল। দশ মিনিটের পথ পাঁচ মিনিটে অতিক্রম করিয়া দোকানের রাস্তায় পড়িল।

দোকানের বন্ধ দরজায় ঠেস দিয়া কে একজন বসিয়া আছে। খুব কাছে না আসা পর্য্যন্ত নগেন তাহাকে দেখিতে পায় নাই, দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। লোকটার মুখের কাছে অঙ্গারের মত চুরুটের আগুন জ্বলিতেছে ; নগেনকে দেখিযা সে উঠিযা দাঁড়াইল, মুখের কাছে মুখ আনিয়া বলিল,— 'আহ্ !'

নগেন চিনিল, ছুরির মালিক। সে জড়বৎ দাঁড়াইয়া রহিল ; তাহার মস্তিষ্ক আর কাজ করিতেছে না, এই অভাবনীয় সংস্থিতির ফলে যেন অসাড় হইয়া গিয়াছে। লোকটা বলিল—'সন্ধ্যে থেকে এখানে বসে আছি ; এত তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ কবেছিলে কেন ? আমার ছুরি দাও।'

লোকটা হাত পাতিল। পকেটেব মধ্যে ছুরি ও গহনাগুলা একসঙ্গে ছিল, নগেন যন্ত্রচালিতের মত সব কিছু বাহির করিয়া তাহার হাতে দিল।

লোকটার মুখে চুরুটের আগুন একটু উজ্জ্বল হইল, সে সম্মুখে ঝুঁকিয়া সেই আলোতে হাতেব জিনিষগুলা পরীক্ষা করিল ; তাহার নীল চক্ষু-দুটা ও মুখের খানিকটা দেখা গেল। একটা অমানুষী উল্লাস তাহার মুখে ফুটিযা উঠিল, গলার মধ্যে চাপা হাসির খস্ খস্ শব্দ হইল ; যেন সে সব জানে, সব বুঝিয়াছে। তারপর হঠাৎ সে পিছু ফিরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল ; অন্ধকারে তাহার বুটের খট্‌খট্ শব্দ দূরে মিলাইয়া গেল।

নগেনের মনে হইল, তাহার দেহমনের সমস্ত শক্তি ফুরাইয়া গিয়াছে ; দুর্বহ অবসাদ ও ক্লান্তি তাহাকে চাপিয়া মাটিতে মিলাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। এই কয়দিন সে একটা প্রবল নেশায় মত্ত হইযা ছিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে নাই ; আজ হঠাৎ ছুরিটা চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে।

পা দু'টা অতিকষ্টে টানিয়া টানিয়া সে বাড়ী ফিরিল।

ক্ষণার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া বিছানার উপর ক্ষণার রক্তমাখা মৃতদেহটা দেখিয়া সে ভয়ে আর্তনাদ করিয়া উঠিল। সে জানে সে নিজেই এ কাজ করিয়াছে; তবু যেন ইহার জন্য সে দায়ী নহে। কোথাকার এক ভোগ-লোলুপ রাক্ষস ঐ অভিশপ্ত ছুরিটা পাইয়া নিজের লালসা চরিতার্থ করিয়াছে।

ছুটিতে ছুটিতে বাড়ীর বাহির হইয়া সে পাশের বাড়ীর দরজায় গিয়া সজোরে ধাক্কা দিতে লাগিল,—'ও মশায়, রমেশবাবু, শিগ্‌গির দরজা খুলুন—'

প্রতিবেশী ভদ্রলোক দরজা খুলিয়া বলিয়া উঠিলেন,—'এ কি, কী হয়েছে!'

হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া নগেন বলিল,—'আমার স্ত্রীকে কারা খুন ক'রে রেখে গেছে।'

'অ্যাঁ! ঢুক্‌লো কি করে?'

'জানিনা। হয়তো আমার স্ত্রী সদর দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল —তার হাতের চুড়ি গলার হার সব নিয়ে গেছে। আসুন শিগ্‌গির—'

* * *

ইহার পর প্রায় বছরখানেক কাটিয়া গিয়াছে। নগেন আবার বিবাহ করিয়াছে। নূতন বধূটি সুন্দরী নয়, কিন্তু উজ্জ্বল যৌবনবতী।

মাঝে মাঝে ছুরির কথা নগেনের মনে হয়। তখন তাহার শরীরের স্নায়ুপেশী শক্ত হইয়া ওঠে; সে দৃঢ়ভাবে চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকে, প্রাণপণে ভুলিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ছুরিটা তাহার জীবনে অভিশাপ কি আশীর্বাদ রূপে দেখা দিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারে না।

নবীনা বধূ পিছন হইতে আসিয়া তাহার কাঁধের উপর হাত রাখে, জিজ্ঞাসা করে,—'কিসেব ধ্যান হচ্ছে ?'

নগেনের স্নায়ুপেশীর কঠিনতা শিথিল হয়, ছুবির কথা আর তাহার মনে থাকে না। মন মাধুর্যে ভরিয়া ওঠে।

সে হাসিয়া বলে,—'তোমার।'

আকাশবাণী

ক্লাবের বারান্দায় আমরা কয়েকজন সভ্য নীরবে বসিয়া ধূমপান করিতেছিলাম। ফাগুন মাসের অপরূপ একটি গোধূলি যেন বাতাসে গোরোচনার স্নিগ্ধ শীকর-কণা ছড়াইতেছিল। এমন সন্ধ্যায় বরদার মুখেও ভূতের গল্প বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, সে গুন গুন করিয়া একটি প্রেমের গান ভাঁজিতেছিল। 'যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখী'।

এমন সময় সুধাংশু আসিয়া দেখা দিল। সুধাংশু আমাদের বন্ধু হইলেও এতদিন ক্লাবের সভ্য ছিল না, সম্প্রতি হইয়াছে। সম্ভবত বরদার সঙ্গে ভূতপ্রেত লইয়া তর্ক করিবার মতলব লইয়াই সে ক্লাবে ঢুকিয়াছে। প্রেতযোনি সম্বন্ধে এতবড় নাস্তিক বড় একটা দেখা যায় না; বরদার সঙ্গে চোখাচোখি হইলেই তাহার মুখ লড়ায়ে মেড়ার মত যুযুৎসু ভাব ধারণ করিত। তারপর দুজনের মধ্যে যে তর্ক আরম্ভ হইত তাহার তুলনা খুঁজিতে হইলে রামায়ণ মহাভারতের শরণাপন্ন হইতে হয়। কিন্তু আজ লক্ষ্য করিলাম, সুধাংশুর সে তেজ নাই, মুখখানা কেমন যেন ফ্যাকাসে। মনের মধ্যে সে যেন বড়রকম ধাক্কা খাইয়াছে।

অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল,—'হে সুধাংশু, কেন পাংশু বদন তোমার?'

সুধাংশু উত্তর দিল না, সোজা বরদার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। তদ্‌গত-ভাবে কিছুক্ষণ তাহার মুখের পানে তাকাইয়া থাকিয়া গাঢ় স্বরে কহিল,—'ভাই বরদা, পায়ের ধুলো দাও।' বলিয়া তাহার পায়ে হাত ঠেকাইয়া মাথায় স্পর্শ করিল।

আমরা সকলে হাঁ করিয়া রহিলাম ; এমন কাণ্ড জীবনে দেখি নাই। বরদাও ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গিয়াছিল ; সুধাংশুর হাত ধরিয়া পাশের চেয়ারে বসাইতেই সে বলিয়া উঠিল,—'তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। কালকের ঘটনার পর আর আমার প্রেতযোনিতে অবিশ্বাস নেই।'

অতঃপর 'কালকের ঘটনা' শুনিবার জন্য আমরা তাহাকে ঘিরিয়া বসিলাম। কিছুক্ষণ উন্মনাভাবে আকাশের পানে তাকাইয়া থাকিয়া সুধাংশু আরম্ভ করিল—

মাসখানেক হ'ল আমাদের পাড়ায় একটি নতুন বাঙ্গালী ভদ্রলোক এসেছেন—প্রিয়তোষবাবু। ওই যে বাড়ীখানা আগে মাইনর· স্কুল ছিল, সেই বাড়ী ভাড়া নিয়ে আছেন। বাড়ীর চারধারে পাঁচিলঘেরা ফাঁকা জমি ; হলদে রঙ্গের বাড়ীখানা। দেখেছ বোধহয়।

প্রথম দিনই প্রিয়তোষবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। পাড়ায় নতুন বাঙ্গালী এসেছেন, তাই সাদর সম্ভাষণ করবার জন্যে নিজে উপযাচক হয়ে তাঁর কাছে গিয়েছিলুম। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়সের একটু সৌখীন গোছের ভদ্রলোক ; প্রথমদিন এসেই মিস্ত্রী ডাকিয়ে বাড়ীর মাথার ওপর রেডিওর এরিয়েল বসাচ্ছিলেন। আমার সঙ্গে মামুলি দু'চারটে কথা হ'ল। কাজ-কর্ম কিছু করেন না ; পয়সা আছে। পুত্রকলত্রও কেউ নেই—বছর দশেক আগে পত্নীবিয়োগ হয়েছে। তার পর থেকে খেয়ালমত এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ান। এর আগে বছর দেড়েক গয়ায় ছিলেন। সেখানে আর মন টিক্‌ল না তাই চলে এসেছেন।

ভদ্রলোক একলা থাকেন, অথচ এত বড় বাড়ী নিয়ে কি করবেন, এই ভেবে তখন একটু আশ্চর্য মনে হয়েছিল। কিন্তু প্রথম আলাপেই তো ও কথা জিজ্ঞাসা করা যায় না। তিনি যে সব আসবাবপত্র সঙ্গে এনেছিলেন

তাও বেশ দামী আর সৌখীন। দেখলুম লোকটি বিপত্নীক এবং বয়স্থ হলে কি হয়, প্রাণটা বেশ তাজা রেখেছেন।

তারপর আরও বার দুই তাঁর বাড়ীতে গিয়েছিলুম। তাঁর চরিত্রে দু'একটি ছোট-খাটো অসঙ্গতি চোখে পড়েছিল। তিনি সৌখীন লোক, কিন্তু স্বপাক আহার করেন; একটিমাত্র শুকো চাকর রেখেছেন, সে দিনের বেলা কাজকর্ম সেরে বাড়ী চলে যায়। তাঁর বাড়ীতে মেয়েমানুষের পাট নেই, অথচ বসবার ঘরটি ছবির মত সাজিয়ে রেখেছেন। পুরুষ-মানুষ যে এত গোছালো হ'তে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। আরও লক্ষ্য করলুম, লোকটি যে পরিমাণে অমায়িক সে পরিমাণে মিশুক নয়। কথা ভারি মিষ্টি, কিন্তু কম কথা বলেন। কথা বলতে বলতে বা শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। তাছাড়া আমি তিনবার তাঁর বাড়ীতে গেলুম, তিনি একবারও তার পাল্টা দিলেন না। ঐকটু বিরক্তি বোধ হ'ল; সন্দেহ হল, তিনি হয়তো মনে করেন তাঁকে বড়লোক মনে করে আমি তাঁর মোসাহেবি করবার চেষ্টা করছি। যাওয়া বন্ধ করে দিলুম। তারপর পথেঘাটে মাঝে মাঝে দেখা হ'ত, এই পর্যন্ত।

এইভাবে হপ্তা তিনেক কেটে গেল। প্রিয়তোষবাবুর সম্বন্ধে মনটা যখন প্রায় নির্লিপ্ত হয়ে এসেছে এমন সময় তাঁর নামে কয়েকটা কথা কানে এল। এসব খবর মেয়েদের কানেই আগে পৌছোয়; আমার স্ত্রী খবরটা দিলেন। প্রিয়তোষবাবু নাকি সুবিধের লোক নন, রাত্রি দশটার পর তাঁর বাড়ীতে মেয়েমানুষের গলার আওয়াজ শোনা যায়। পাড়ার কেউ কেউ শুনেছে।

এমন কিছু অসম্ভব কথা নয়, কিন্তু মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। প্রিয়তোষবাবুকে যেটুকু দেখেছিলুম তাতে তাঁকে লম্পট দুশ্চরিত্র বলে মনে

হয়নি। তবু, কিছুই বলা যায় না। যাদের সারা জীবন ধরে দেখছি তাদেরই চিনতে পারলুম না, আর প্রিয়তোষবাবুর চরিত্র এক নজরে চিনে নেব এত অহঙ্কার আমার নেই।

তা ছাড়া, সত্যি হোক আর মিথ্যে হোক, এ বিষয়ে করবার কিছু নেই ; করবার মধ্যে বৈঠকখানায় বসে মুখরোচক জল্পনা করতে পারি। অন্তত তখন তাই মনে হয়েছিল।

কাল সকালবেলা পাড়ার ছোকরা দলের চাঁই ভূতো আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। ভূতো ডাকাবুকো ছেলে, মনের মধ্যে মারপ্যাঁচ নেই ; মেজাজ কড়া। সে এসেই প্রিয়তোষবাবুর কথা তুললে,—'শুনেছেন বোধহয় ?'

দেখলুম ভূতোর মন এখনও আমাদের মত নির্লিপ্ত জল্পনাপ্রবণ হয়ে ওঠেনি। কুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করতে হ'ল,—'কিছু কিছু শুনেছি বৈকি।'

ভূতো টেবিলের ওপর কীল মেরে বললে,—'এ রকম লোক পাড়ায় রাখা যেতে পারে না। ছেলেরা বলছে, একদিন ধরে দু'ঘা দেওয়া যাক, তাহলেই পালাবে।'

ভূতো আর তার দল বয়সে আমাদের চেয়ে অনেক ছোট, কিন্তু মনে মনে তাদের বাহুবলকে সম্ভ্রম করি। তবু ক্ষীণ আপত্তি করে বললুম,—'শুধু কাণাঘুষোর ওপর এতটা বাড়াবাড়ি করা কি ঠিক হবে ? বরং কথাটা সত্যি কিনা ভালভাবে যাচাই করে যা হয় করা উচিত।'

ভূতো বললে,—'বেশ তো, আপনিই যাচাই করুন।'

অতঃপর ভূতোর সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক হ'ল রাত্রে গিয়ে প্রিয়তোষ-বাবুর বাড়ীতে আড়ি পাতা। কাজটা মোটেই রুচিকর মনে হ'ল না ; কিন্তু একটা লোককে উত্তম-মধ্যম দেবার আগে তার অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া ভাল।

রাত্রি সাড়ে দশটার পর খাওয়া-দাওয়া সেরে রবার-সোল্ জুতো পায়ে দিয়ে বেরুলুম। স্ত্রীকে বলে গেলুম,—'ফিরতে হয় তো দেরি হবে। ঘুমিও না। দিল্লী থেকে 'ফিল্মি গান' দিচ্ছে, রেডিওতে তাই শোন।'

প্রিয়তোষবাবুর ফটকের সামনে ভৃত্যের সঙ্গে দেখা হ'ল। ভূতোটা এমন গোঁয়ার, জুতো পরে এসেছে যার আওয়াজ দেড় মাইল দূর থেকে শোনা যায়। তাকে বললুম,—'ও জুতো পরে তোমার ভেতরে যাওয়া চলবে না। শিকার ভড়্কে যাবে।'

সে বললে,—'বেশ, আমি বাইরে পাহারায় রইলুম।'

রাস্তা তখন নির্জন হয়ে গেছে। প্রিয়তোষবাবুর বাড়ী অন্ধকার। ফটক পার হয়ে পা টিপে টিপে চললুম। বাড়ীর সাম্না-সামনি এসে সদর দরজার মাথার ওপর থিলেনের কাঁচের ভিতর দিয়ে একটু আলো চোখে পড়ল।

ঘরের দরজা জান্লা সবই বন্ধ, কিন্তু ভেতর থেকে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন আসছে—যেন কারা খাটো গলায় কথা কইছে। আমার বুকের মধ্যে একবার দুড়দুড় করে উঠ্ল—কারণ, পরের বাড়ীতে গিয়ে চোরের মত আড়ি পাতার অভ্যেস কোনকালে নেই। যদি ধরা পড়ি তাহলে কী বলব, তার একটা খসড়া মনে মনে মকৃশ করে রেখেছিলুম; কিন্তু স্নায়ুর কম্পন তাতে থামল না। যা হোক, অপ্রীতিকর কর্তব্য যখন করতেই হবে তখন দ্বিধা করে লাভ নেই।

বাড়ীর সামনে এক ফালি খোলা বারান্দা, তারপরই বৈঠকখানা ঘর। যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে বৈঠকখানার বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। একটু একটু হাওয়া দিচ্ছিল—ফাগুন রাতের হাওয়া—ঠাণ্ডা আর মোলায়েম। এমন কিছু বুড়ো হইনি। মনে হ'ল, এমন রাত্রে কোনও

প্রণয়ীর ঘরে গুপ্তচরবৃত্তি করা একটা অপরাধ, তা হোক না সে অবৈধ-প্রণয়! কিন্তু সে যাক, ওটা মনের ক্ষণিক দুর্বলতা মাত্র।

ঘরের মধ্যে দু'জন লোক কথা কইছে; বেশ সহজ গলাতেই কথা কইছে। একজনের গলা চিনতে কষ্ট হল না, নিঃসংশয়ে প্রিয়তোষবাবুর গলা। অন্য গলাটি—হ্যাঁ, স্ত্রীলোকেরই বটে। মিষ্টি ভরা গলা—কিন্তু ঠিক যেন স্বাভাবিক নয়; এস্রাজের তারের আওয়াজের মত তাতে একটা ধাতব ঝঙ্কার আছে।

কান পেতে শুনতে লাগলুম। গলার আওয়াজ বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে, কিন্তু কথাগুলো ঠিক ধরতে পারছি না। একবার মনে হ'ল প্রিয়তোষবাবু কবিতা আবৃত্তি করছেন—'তুমি সকল সোহাগ সয়েছিলে সখি—'……তারপর কিছুক্ষণ কথাবার্তা অস্পষ্ট হয়ে গেল। দোরের কাছে কান নিয়ে গিয়ে শোনবার চেষ্টা করলুম……কথাবার্তার সুর বদলে গেছে—মান অভিমানের পালা চলছে। মনে হ'ল যেন মেয়েলি গলা বলছে……'যাও, তোমার সঙ্গে আর কথা কইব না…আর আস্‌বোও না…কেন তুমি—?'

আমার মনের মধ্যে শুধু বিস্ময়ই নয়, আতঙ্কও জমা হয়ে উঠছিল। কারণ, মেয়েলি গলাটি কেবল বাঙ্গালী মেয়ের গলাই নয়, শিক্ষিত মার্জিত বাঙ্গালী মহিলার গলা! মনে মনে ঘেমে উঠ্‌ছিলুম আর ভাবছিলুম—কে হ'তে পারে?

হঠাৎ ঘরের মধ্যে সব আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। প্রায় দশ সেকেণ্ড আর কোনও শব্দ নেই। তারপর একটি সুমিষ্ট ব্যঙ্গ-হাসি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ল।

হাসি থামলে স্পষ্ট স্ত্রীকণ্ঠ শুনতে পেলুম—'একটি ভদ্রলোক দোরের কাছে দাঁড়িয়ে আড়ি পাতছেন। যাও, আদর ক'রে ঘরে এনে বসাও।'

চমকে উঠলুম। পালাব কিনা ভাবছি, এমন সময় প্রিয়তোষবাবু দরজা খুলে দাঁড়ালেন। ঘরের মধ্যে আলো ছিল, মৃদুশক্তির একটা নীল বাল্‌ব জ্বলছিল; দেখলুম প্রিয়তোষবাবুর মুখে বিরক্তি এবং ক্ষোভ মাখান রয়েছে বটে কিন্তু অবৈধপ্রণয়ে ধরা পড়ার লজ্জা সেখানে লেশমাত্র নেই। তিনি বললেন,—'আসুন।'

একরকম অসাড় ভাবেই ঘরে ঢুকলুম। ঘরের মধ্যে কিন্তু আর কেউ নেই; মেয়েলি গলার অধিকারিণী কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেছে। কেবল ঘরের একপাশে রেডিও সেটের ভেতর থেকে আলো বেরুচ্ছে; যেন প্রিয়তোষবাবু এতক্ষণ বসে রেডিও শুন্‌ছিলেন, যন্ত্রটা বন্ধ না করেই দরজা খুলতে এসেছেন।

প্রিয়তোষবাবু যদি আমার সঙ্গে রূঢ় আচরণ করতেন তাহলে আমিও একটু জোর পেতুম কিন্তু এতই ভদ্রভাবে আমাকে রেডিওর কাছে নিয়ে গিয়ে বসালেন যে, আমার মুখে আর কথা যোগালো না। তিনি নিজের মুখের ওপর দিয়ে একবার হাত চালিয়ে ধীরভাবে প্রশ্ন করলেন,—'কিছু দরকার আছে কি?'

আমি উত্তর দেবার আগেই সেই ব্যঙ্গহাসি আমার কানের কাছে আবার ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। আমি ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে দেখি, আওয়াজটা আসছে রেডিওর ভেতর থেকে! তারপরই কথা শুনতে পেলুম, বিদ্রূপভরা তীক্ষ্ণ কণ্ঠের কথা—'দরকার আছে বৈকি। তুমি কার সঙ্গে কথা কইছ তাই চুরি ক'রে শুনতে এসেছেন!'

সভয়ে রেডিওর কাছ থেকে সরে এলুম। মাথার চুল বোধহয় খাড়া হয়ে উঠেছিল, গায়েও কাঁটা দিয়েছিল। বিহ্বলভাবে জিজ্ঞাসা করলুম,—'এ কি? কে কথা কইছে, প্রিয়তোষবাবু?'

প্রিয়তোষবাবু একবার চোখ তুলে আমার পানে চাইলেন, তারপর মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে বললেন,—'আমার স্ত্রী।'

'আপনার স্ত্রী! কিন্তু—'

রেডিওর মধ্যে থেকে গঞ্জনাভরা কঠিন স্বর বেরিয়ে এল,—'কিন্তু তিনি মারা গেছেন—এই না? তাতে আপনার কী? আপনি কেন আমার স্বামীকে বিরক্ত করতে এসেছেন? যান—বাড়ী যান। কী রকম ভদ্রলোক আপনি? আমার স্বামীর চরিত্র তদারক করবার কী অধিকার আছে আপনার? উনি আপনাদের পাড়ায় এসে আছেন, আপনাদের পাড়া পবিত্র হয়ে গেছে—জানেন তা?' তারপর হঠাৎ এই তপ্ত ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বর উদ্বেগে যেন গলে গেল—'ওগো যাও, এবার শুয়ে পড় গিয়ে—নইলে শরীর খারাপ হবে। অনেক রাত হয়েছে।'

প্রিয়তোষবাবু উঠে দাঁড়ালেন। আমার মাথার ভেতরটা তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল, নেহাৎ গ্রাম্য লোকের মত বললুম,—'কিন্তু কিছু যে বুঝতে পারছি না! রেডিওর ভেতর থেকে—?'

ক্লান্ত স্বরে প্রিয়তোষবাবু বললেন,—'রেডিওতে আমার স্ত্রী রোজ এই সময় আমার সঙ্গে কথা কন। তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই এমনি হয়ে আসছে। আমার জীবনের এই একমাত্র সম্বল। উনিই সংসার চালান, উনিই সব কিছু করেন—আমি শুধু ওঁর কথা মত কাজ করে যাই।'

বিস্ময়ের ঘোরে মনটা তখনও অর্ধ-মূর্ছিত হয়ে ছিল; বললুম,—'কিন্তু এ কি করে সম্ভব হয়—?'

রেডিও থেকে অধীর উত্তর এল,—'আপনি সে বুঝবেন না—বোঝবার বৃথা চেষ্টাও করবেন না। তার চেয়ে বাড়ী যান।—আপনার স্ত্রীর বুকের

ব্যামো আছে না? ভাল চান তো শিগ্‌রির বাড়ী যান, নইলে হয়তো আর দেখতে পাবেন না।'

শেষের দিকে কথাগুলো ভয়ঙ্কর গম্ভীর হয়ে উঠল।

সেই যে সাধু ভাষায় বলে বেত্রাহত কুক্কুর, ঠিক সেইভাবে প্রিয়তোষ-বাবুর বাড়ী থেকে বেরিয়ে নিজের বাড়ীমুখো দৌড়োতে আরম্ভ করলুম। পথে ভূতো বোধহয় সঙ্গ নিয়েছিল, কিন্তু সেটা জাগ্রত চেতনার কথা নয়—আবছায়া একটা অনুভূতি মাত্র।

বাড়ী পৌছে দেখি, বসবার ঘরে রেডিওটা খোলা রয়েছে, কিন্তু তার ভেতর থেকে কোনও আওয়াজ বেরুচ্ছে না। আর মেঝের ওপর মাদুর পেতে স্ত্রী পড়ে আছেন। তাঁর দু' চোখ বন্ধ; একটা হাত এমন অস্বাভাবিকভাবে ছড়ানো রয়েছে যে, মনে হয়—

মনের অবস্থা বুঝতেই পারছ। প্রায় তাঁর ঘাড়ের ওপর আছড়ে পড়লুম। তিনি ধড়্‌মড়্‌ করে উঠে বসে বললেন,—'অ্যাঁ—এলে! আমার একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিল—'

রেডিওর মধ্য থেকে তরল কৌতুকের হাসি এস্রাজের ধাতব মূর্ছনার মত বেরিয়ে এল। তারপর সেই গলার আওয়াজ,—'কেমন জব্দ! আর যাবেন পরের হাঁড়িতে কাঠি দিতে?...স্বামী-স্ত্রীর কথা চুরি করে শুনতে গিয়েছিলেন তাই একটু ভয় দেখালুম। আর কখনও এমন কাজ করবেন না...'

নিষ্পত্তি

শহর হইতে মাইল তিনেক দূরে গঙ্গার তীরে একটি পাথরের টিলা আছে। মাটির দিক হইতে টিলাটি ধীরে ধীরে উঁচু হইয়াছে, কিন্তু গঙ্গার মুখোমুখি পৌঁছিয়া একেবারে হঠাৎ খাড়া নীচে নামিয়া গিয়াছে; মনে হয় গঙ্গাদেবী তাঁহার ক্ষুরধার স্রোতের দ্বারা টিলাটির অর্ধেকটা কাটিয়া লইয়া গিয়াছেন। দূর প্রসারিত সমতলভূমির প্রান্তে নদীর কিনারে এই টিলা অনেক দূর হইতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে; কিন্তু স্থানটি নির্জন, লোকজন বড় কেহ এদিকে আসে না। শোনা যায়, পুরাকালে কোন্ এক মুদ্‌গল মুনি এখানে বসিয়া তপস্যা করিতেন।

শরৎকালের এক স্বচ্ছ অপরাহ্ণে পরমেশবাবু গঙ্গার ধার দিয়া টিলার পানে চলিয়াছিলেন। সূর্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু পশ্চিম দিগ্বধূর বর্ণ-প্রসাধন এখনও আরম্ভ হয় নাই। গঙ্গার পালিশ করা সুচিক্কণ বুকে জলের গতি আছে, কিন্তু চঞ্চলতা নাই। পরমেশবাবুও চলিয়াছিলেন তৃপ্তি মন্থর চরণে; তাঁহার গতির একটা লক্ষ্য ছিল বটে, কিন্তু ত্বরা ছিল না।

পরমেশ কিছুদিন হইতে মনে একটি অচঞ্চল শান্তি অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহার বয়স এখন পঞ্চাশোর্ধে; সম্প্রতি মোটা পেন্সন লইয়া চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার গোলগাল শরীরটি এখনও বেশ নিরেট ও নিরাময় আছে। তিনি নিঃসন্তান; কয়েক বৎসর পূর্বে পত্নীও গত হইয়াছেন। এইরূপ সর্বাঙ্গীন অনুকূল অবস্থার মধ্যে পড়িয়া তাঁহার মনটি স্বভাবতই প্রসন্ন শান্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

চারিদিকে মুগ্ধ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে তিনি চলিয়াছিলেন, মনে মনে বলিতেছিলেন,—'আহা মধু মধু—মধু বাতা ঋতায়তে—'

টিলার কাছাকাছি পৌঁছিয়া পরমেশের মনে পড়িল কেন তিনি বহুবর্ষ পরে এদিকে আসিয়াছেন। ছেলেবেলায় স্কুলে-কলেজে পড়ার সময় তিনি প্রায়ই এই টিলায় আসিয়া বসিতেন; কারণ তখন হইতেই তাঁহার মন ভাবপ্রবণ। কিন্তু গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে আর এদিকে আসা হয় নাই। পরমেশ সস্নেহ দৃষ্টিতে টিলা নিরীক্ষণ করিলেন; টিলা ঠিক তেমনই আছে। ত্রিশ বৎসরে কিছুমাত্র বদলায় নাই। ক্ষণেকের জন্য তাঁহার মনে হইল, ত্রিশ বছর বুঝি কাটে নাই, পৃথিবী যেমন ছিল তেমনি আছে। কিন্তু পরক্ষণে তাঁহার স্মরণ হইল, আজ সকালে তিনি একটি চিঠি পাইয়াছেন এবং তাহারই ফলে আজ এখানে আসিয়াছেন। তাঁহার মনের উপর একটি ছায়া পড়িল।

সকালবেলা তিনি যে চিঠি পাইয়াছেন তাহাতে এই কথাগুলি লেখা ছিল—

ভাই পরমেশ, আমাকে নিশ্চয় ভোলোনি। ইস্কুলে কলেজে একসঙ্গে পড়েছি; সর্বদা আমরা একসঙ্গে থাকতাম, প্রায় সন্ধ্যেবেলা সেই মুদ্‌গল মুনির পাহাড়ে গিয়ে বসতাম। লোকে বলত মাণিকজোড়। আমি সেই খোদন।

ছেলেবেলায় তুমিই ছিলে আমার প্রাণের বন্ধু—friend philosopher and guide. তারপর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, সে আজ কতদিনের কথা! তিরিশ বছরের কম নয়। সেই থেকে আর আমাদের দেখা হয়নি। কিন্তু তোমার কথা প্রত্যহ মনে পড়ে। অনেকবার মনে হয়েছে তোমাকে চিঠি লিখি, কিন্তু সংসারের নানা ঝঞ্ঝাটে লেখা হয়নি। তবে

তুমি পেন্সন নিয়ে বাড়ীতে আছ সে খবর পেয়েছি। আমারও তো পেন্সন নেবার সময় হল, কিন্তু—

ভাই, আমি বড় বিপদে পড়েছি। কী বিপদ তা চিঠিতে লেখা যাবে না। তোমার সঙ্গে দেখা করা দরকার কিন্তু তোমার বাড়ীতে যাবার সাহস নেই। আগামী শুক্রবার সন্ধ্যার সময় তুমি যদি মুদ্‌গল মুনির টিলাতে যাও তাহলে আমার সঙ্গে দেখা হবে, তখন সব কথা বলব। ভাই আমাকে উদ্ধার করতেই হবে; তুমি ছাড়া আর কেউ তা পারবে না। একলা এসো কেউ যেন জানতে না পারে। —তোমারই খোদন।

পুনঃ—পঞ্চাশটি টাকা সঙ্গে এনো; আমি তোমার কাছে ভিক্ষে চাইছি। যদি নিতান্তই না পারো অন্তত পঁচিশ টাকা এনো।

এতক্ষণে পরমেশ টিলার পাদমূলে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন; একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি উপরে উঠিতে লাগিলেন। উঠিবার পথ চারিদিকে বড় বড় পাথরে আকীর্ণ সংসার পথের মতই দুর্গম। পরমেশের মনে পড়িল ছেলেবেলার খোদনের মুখ; সংসার চিন্তাহীন কচি কিশোর মুখ। এখন তাহার চেহারা কেমন হইয়াছে কে জানে! পরমেশ একটু লজ্জিত হইয়া ভাবিলেন, গত ত্রিশ বছরের মধ্যে খোদনের স্মৃতি বোধ করি পাঁচ বারও তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। অথচ একদিন সত্যই তাঁহারা অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন। কে জানে খোদনের কী বিপদ হইয়াছে।

টিলার ডগায় উঠিয়া তিনি কিন্তু খোদনের কথা ভুলিয়া গেলেন; চারিদিকে অপরূপ সৌন্দর্যে তাঁহার মন ভরিয়া গেল। আকাশে কাশ-পুষ্প উড়িতেছে, সম্মুখে সুদূর বিস্তার গঙ্গা। টিলাটি যেন একটি প্রকাণ্ড সিংহাসন, গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া বসানো হইয়াছে। পঞ্চাশ হাত নীচে তাহার প্রস্তরময় চরণ জলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। টিলার পদমূলে

গঙ্গার জল চঞ্চল, মজ্জিত পাথরে উপহত হইয়া কল কল শব্দে বহিয়া যাইতেছে।

পরমেশ হৃষ্টমনে উপবেশন করিলেন। কুলুঙ্গির মত বসিবার স্থান, পাথরের মেঝের উপর সবুজ মখমলের মত শ্যাওলার নরম আস্তরণ বিছানো রহিয়াছে। এখানে বসিলে পাশে বা পিছনে কিছু দেখা যায় না—কেবল পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত নদী ও বালুচর চোখের সম্মুখে বিস্তৃত হইয়া থাকে। এখানে জীবন ও মৃত্যুর ব্যবধান বড় কম, শরীরের ভার-কেন্দ্র একটু বিচলিত হইলে পঞ্চাশ হাত নীচে পড়িয়া দেহত্যাগ অবশ্যম্ভাবী তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গালাভ। মুদ্‌গল মুনি বাছিয়া বাছিয়া তপস্যা করিবার স্থানটি ভালই আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

জলকণাস্নিগ্ধ বায়ু পরমেশের ললাট স্পর্শ করিল। সূর্য প্রতীচীর দিকে আর একটু ঢলিয়াছে; নদীর বুকে রৌদ্রের প্রতিফলন কাঁসার বর্ণ ধারণ করিয়াছে। ওপারে চরের উপর কাশবনে কয়েকটি গরু চরিতেছে। পরমেশ মনে মনে বলিলেন,—'আহা—মাধ্বীর্গাবো—'

এই রমণীয় নিসর্গ শোভা হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া পরমেশ সহসা চমকিয়া উঠিলেন; দেখিলেন পাশের দিকে হাত পাঁচ ছয় দুরে পাথরের চ্যাঙড়ের ওপারে একটি উট গলা বাড়াইয়া তাঁহার পানে চাহিয়া আছে। তিনি কেবল উটের মুখ হইতে গলা পর্যন্ত দেখিতে পাইলেন। উটের বোধ হয় কিছুদিন পূর্বে বসন্ত হইয়াছিল, কারণ তাহার মুখময় কালো কালো দাগ। তা ছাড়া, উট অন্তত দুই হপ্তা দাড়ি কামায় নাই, থলথলে অথচ শীর্ণ গালে রাশি রাশি কাঁচা-পাকা লোম গজাইয়াছে। রম্য পরিবেশের মাঝখানে এই বেথাপ্পা মূর্তি দেখিয়া পরমেশ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

উট তখন লম্বা লম্বা হলুদবর্ণ দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল,—

'চিনতে পারলে না—আমি খোদন। তোমাকে কিন্তু দেখেই চিনেছি।'

খোদন আসিয়া পরমেশের পাশে বসিল। বোতামহীন কামিজ ও ছেঁড়া ধুতির নোংরা মলিনতা অবর্ণনীয় ; শরীরটা বোধ করি ততোধিক নোংরা। একটা দূষিত গন্ধ আসিয়া পরমেশের নাকে লাগিল। এই খোদন ! দেখিলেও প্রত্যয় হয় না। কিন্তু পবমেশ লক্ষ্য করিলেন, এই ব্যক্তির নাকের ডগায় পরম পরিচিত একটি জটুল রহিয়াছে। সুতরাং চেহারার যত বদলই হোক, খোদনই বটে। কিন্তু খোদন এমন হইয়া গেল কি করিয়া !

পরমেশ গলাটা একবার ঝাড়িয়া প্রশ্ন কবিলেন,—'কি হয়েছে তোমার ?'

প্রশ্নটা একটু নীরস শুনাইল। এতদিন পরে বাল্যবন্ধুর সাক্ষাৎ, কিন্তু চেষ্টা করিযাও তিনি কণ্ঠস্বরে সহৃদয়তা আনিতে পারিলেন না।

খোদন ধূর্ততাভরা চক্ষুতে অনেকখানি করুণ রস সঞ্চারিত করিয়া হাত কচ্‌লাইতে লাগিল। তাহার শুধু চেহারার পবিবর্তন হয় নাই, মনের পরিবর্তন হইয়াছে। সে দমকা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—আরে ভাই, কথায় বলে দশচক্রে ভগবান ভূত। নইলে, ভাল চাকরি করছিলুম, ওপরওয়ালার সুনজরে ছিলুম, স্ত্রীপুত্র নিয়ে ঘরসংসার করছিলুম—আমার আজ এ দশা হবে কেন ?' এই পর্যন্ত বলিয়া হঠাৎ ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল,—'টাকাটা এনেছ তো ভাই ?'

পরমেশ নিঃশব্দে পকেট হইতে পঞ্চাশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন। লুব্ধ ব্যগ্রতায় নোটগুলি ছোঁ মারিয়া লইয়া খোদন সেগুলি

ক্ষিপ্রহস্তে গণিয়া দেখিল, তারপর অতি যত্নে কোমরে গুঁজিয়া রাখিতে রাখিতে বলিল,—'বাঁচালে। কিছুদিন এতেই চলবে।' তাহার ধূর্ত চক্ষু একবার পরমেশকে তীক্ষ্ণভাবে নিরীক্ষণ করিয়া লইল ; যে লোক এককথায় পঞ্চাশ টাকা বাহির করিতে পারে, তোযাজ করিলে তাহার নিকট হইতে আরও অনেক টাকা দোহন করা যাইতে পারে, এই কথাটাই তাহার ধূর্ত দৃষ্টির আড়াল হইতে উঁকি মারিল। সে কণ্ঠস্বরে অনেকখানি চাটুতার রস নিঙরাইয়া দিয়া বলিল,—'মহাপ্রাণ লোক ভাই তুমি। অনেক পুণ্যে তোমার মত বন্ধু পাওয়া যায়। ঠিক ছেলেবেলায় যেমনটি ছিলে এখনও তেমনি আছ। আর চেহারাও কি তোমার অতটুকু বদলায় নি! মনে হয় না যে বয়স হয়েছে।'

প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পৌছিয়া এমন কথা শুনিলে মনে আনন্দ হইবার কথা। কিন্তু পরমেশ আনন্দ অনুভব করিলেন না ; বরং তাঁহার মনটা কেমন ভারী হইয়া উঠিল। পশ্চিম দিকপ্রান্তে তখন দিনান্তের হোলি-খেলা আরম্ভ হইয়াছে। শরতের দিনগুলি এমনি বর্ণগরিমায় আরম্ভ হয়, আবার এমনি প্রসন্ন লীলাবিলাসে সমাপ্ত হয় ; তাবপর ধীরে ধীরে চাঁদ উঠিয়া আসে। দিন ও রাত্রি, সীমা ও অসীম ওতপ্রোত একাকার হইয়া যায়—মহাকালের স্তিমিত নয়ন স্বপ্নাতুর হইয়া ওঠে —

পরমেশ ঈষৎ উদাসকণ্ঠে বলিলেন,—'তোমার এমন অবস্থা হ'লো কি করে? কী করেছিলে?'

খোদন একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—'ভাই, তোমার কাছে লুকিয়ে লাভ নেই—আমি পুলিশের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।'

পরমেশের মনটা আরও ভারী হইয়া উঠিল। জীবনের অসংখ্য জটিলতা যেন আবার তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিতেছে। পুলিশ! পুলিশ

নামক এক জাতীয় জীব যে পৃথিবীতে বাস করে একথা কিছুদিন যাবৎ তিনি ভুলিয়া ছিলেন।

'কেন? কি হয়েছিল?'

খোদন এবার সবিস্ময়ে নিজের জীবন কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। এই ধরণের আত্মকথা মাঝে মাঝে পুস্তকাকারে প্রকাশ হয়; বক্তা অনুতাপছলে নিজের দুষ্কৃতির লোভনীয় ইতিহাস বর্ণনা করিয়া আনন্দ পায়। কণ্ডুয়ন প্রবৃত্তিই এই শ্রেণীর চরিত কথাব মূল উৎস।

খোদন ভাল চাকরি পাইয়াছিল, বিবাহাদি করিয়া সংসারও পাতিয়াছিল; কিন্তু জীবনের সদ্ব্যবহার সে করে নাই। হয়তো সংসর্গদোষেই সে বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছিল। ক্রমে যোষিৎ আনন্দই তাহার বাঁচিয়া থাকার প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

পরমেশের মত সচ্চরিত্র বন্ধুব সৎসঙ্গের অভাবেই যে তাহার এমন অবনতি ঘটিয়াছিল তাহাতে খোদনের সন্দেহ নাই। কিন্তু সকলই গ্রহের ফের, অদৃষ্টের লিখন খণ্ডাইবে কে? নহিলে আজ তাহার কিসের অভাব। সে তিন শত টাকা পর্যন্ত মাহিনা পাইয়াছে, তা ছাড়া উপরিও যথেষ্ট ছিল। তবু শেষ বয়সে তাহার সর্বনাশ হইয়া গেল। দুর্দৈব আর কাহাকে বলে?

স্ত্রীজাতি অতি ভয়ঙ্কর জাতি। সারা জীবন ধরিয়া নাড়াচাড়া করিয়াও সে স্ত্রীজাতির নারকীয় চাতুরী চিনিতে পারিল না। শেষ বয়সে এক সর্বনাশী কুহকিনীর খপ্পরে পড়িল। খোদনের কোনই দোষ ছিল না, স্ত্রীলোকই তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া মোহের নাগপাশে বাঁধিয়া ফেলিল—

তারপর দোহন আরম্ভ হইল। টাকা চাই, সিল্কের শাড়ী চাই, জড়োয়া গহনা চাই। কী করিবে বেচারা খোদন? শেষ পর্যন্ত দায়ে

পড়িয়া সে গভর্নমেণ্টের টাকা চুরি করিল। চুরি অবশ্য সে করে নাই, ধার বলিয়াই লইয়াছিল; কিন্তু গভর্নমেণ্ট তাহা বুঝিল না, তাহার নামে ওয়ারেণ্ট জারি করিল। নিরুপায় দেখিয়া খোদন ফেরার হইয়াছে।

বরবর্ণিনী দিগ্বধূর জলক্রীড়া দেখিতে দেখিতে কতকটা অন্য মনেই পরমেশ বসিয়া ছিলেন; কিন্তু কথাগুলো কানে যাইতেছিল। শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হইতেছিল, সূর্যে গ্রহণ লাগিয়াছে, বাতাস দুর্গন্ধ অশুচি ধূমে আবিল হইয়া উঠিয়াছে; তাঁহার অন্তর্লোকে প্রসন্নতার যে শুভ-জ্যোতি কিছুদিন ধরিয়া নিষ্কম্প শিখায় জ্বলিতেছিল তাহা নিভিয়া গিয়াছে।

চরিতামৃত শেষ করিয়া খোদন বলিল,—'কপালে লিখিতং ঝাঁ্যাটা কোন্ শালা কিং করিষ্যতি। নইলে কত লোক কত কি করে তাদের কিছু হয় না, চোর-দায়ে ধরা পড়লুম আমি। মাঝে মাঝে মনে হয়—দুত্তোর, সন্নেসী হয়ে যাই; কিন্তু ভাই, সংসার ছাড়তে মন সরে না। হাজার হোক, আমি সংসারী মানুষ; বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতে কি ভাল লাগে? তার ওপর শরীরে একটা পাজি রোগ ঢুকেছে—'

পরমেশ খোদনের কৃষ্ণবিন্দু চিহ্নিত মুখের পানে চাহিলেন—'কি রোগ?'

খোদন কহিল,—'বললুম না ধরা পড়েছে রাধা। সবাই ফুর্তি করে, রোগ হবার বেলা আমি। চিকিচ্ছে করবারও সময় পেলুম না, পালাতে হ'ল। এখন তুমিই ভরসা, তুমিই মরণ-বাঁচন। ছেলেবেলায় তোমার পরামর্শ শুনেই চলতুম, এখন তুমিই একটা বুদ্ধি দাও ভাই, যাতে এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাই। এ কষ্ট আর সহ্য হয় না।'

পরমেশের মনের ভিতরটা অন্ধকার হইয়া গেল—গাঢ় অন্ধকার—কিছু দেখা যায় না। তারপর ধীরে ধীরে রাহুগ্রস্ত সূর্য গ্রহণমুক্ত হইয়া

বাহির হইয়া আসিল। সেই নবোন্মেষিত উগ্র আলোকে পরমেশ খোদনের মুক্তি-পথ দেখিতে পাইলেন। একমাত্র মুক্তি-পথ।

তিনি খোদনের দিকে ফিরিয়া সাগ্রহে বলিলেন,—'উদ্ধার পেতে চাও ? একটা রাস্তা আছে—' 'কী—কা রাস্তা ?'

'এই যে—' বলিয়া পরমেশ দুই হাতে সজোরে খোদনকে ঠেলিয়া দিলেন। খোদন কিছু বুঝিতে পারিবার আগেই শূন্যে একটা ডিগ্‌বাজি খাইয়া নীচে পড়িতে লাগিল।

পঞ্চাশ হাত নীচে গঙ্গার শিলা কণ্টকিত জলে ছপাৎ করিয়া শব্দ হইল।

*　　　*　　　*

পরমেশ টিলা হইতে নামিয়া আসিলেন।

সূর্য অস্ত গিয়াছে। সন্ধ্যা কিরণের সুবর্ণ মদিরা ভাগীরথীর স্ফটিক পাত্রে টলমল করিতেছে। মুদিত আলোর কমল কলিকাটি কোন্ কনকচ্ছটা বিচ্ছুরিত নবপ্রভাতের অভিমুখে ভাসিয়া চলিয়াছে কে জানে।

খোদন বলিয়া কি কেহ ছিল ? অথবা পরমেশের অবচেতনার নক্রসঙ্কুল সমুদ্র হইতে তাহার বিকলাঙ্গ বীভৎস স্মৃতি বাহির হইয়া আসিয়াছিল ? ভয়ের মুখোস—? কষ্টের বিকৃত ভাণ—?

গঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়া পরমেশ চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন। কোথাও জনমানব নাই। তিনি তখন জামা কাপড় খুলিয়া রাখিয়া গঙ্গার জলে অবতরণ করিলেন। শরীর শীতল হইল। আহা, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ—

স্নান শেষ করিয়া পরমেশ আবার বস্ত্রাদি পরিধান করিলেন। দূরে গঙ্গার ওপারে চরের উপর পাখী ডাকিল—টিট্টি-টিট্টিহি—

পরম পরিতৃপ্তির একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া পরমেশ অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন,—'আহা, মধু মধু—'

শাদা পৃথিবী

৬ আগষ্ট ১৯৪৬

বিগ্ বেন্ ঘড়িতে মন্দ্রমন্থর শব্দে তিনবার ঘণ্টা বাজিল। রাত্রি তিনটা। নৈশ লণ্ডনের হিমাচ্ছন্ন বাতাসে এই গম্ভীর নির্ঘোষ তরঙ্গ তুলিয়া বহুদূর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল।

স্যর জন্ হোয়াইট তাঁহার লাইব্রেরী কক্ষে একটি চামড়া-মোড়া চেয়ারে বসিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া ছিলেন। মাথার উপর একটি-মাত্র বৈদ্যুতিক দীপ সাদা বিম্বাবরণের ভিতরে থাকিয়া স্যর জনের কেশহীন ডিম্বাকৃতি মস্তকের উপর আলোক প্রতিফলিত করিতেছিল। অশীতি বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ স্যর জন্ হোয়াইটের নাম জানেনা এমন লোক পৃথিবীতে কমই আছে। একাধারে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, কর্মী ও ভাবুক! পাশ্চাত্য জগতে তিনি একজন ঋষি বলিয়া পরিচিত। তাঁহার প্রাণের উদারতা ও জ্ঞানের গভীরতার সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা একবাক্যে তাঁহাকে আধুনিক যুগের সক্রেটিস্ বলিয়া স্বীকার করেন। এত বয়সেও তাঁহার দৈহিক স্বাস্থ্য ও মানসিক সজীবতা অক্ষুণ্ণ আছে।

বিগ্ বেনের শব্দতরঙ্গ কানে আসিয়া আঘাত করিতেই স্যর জনের ধ্যানস্থির দেহ একটু নড়িয়া চড়িয়া উঠিল, তিনি দেয়ালের ঘড়ির দিকে চক্ষু তুলিলেন। রাত্রি তিনটা! পুরা ছয় ঘণ্টা তিনি এই ভাবে বসিয়া আছেন! কি ভাবিতেছিলেন? সহসা তাঁহার মস্তিষ্কের মধ্যে সহস্র আণবিক বোমার অসহ্য আলোকের মত একটা গগন-বিদারী দীপ্তি জ্বলিয়া উঠিল। যে-প্রশ্ন গত ছয় ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহার মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতে-ছিল—যে-প্রশ্ন তাঁহার দীর্ঘ জীবনের অধিকাংশ সময় জুড়িয়া বসিয়া আছে

—সেই প্রশ্নের পরিপূর্ণ উত্তর মন্ত্রদ্রষ্টা কবির মত তিনি চোখের সম্মুখে দেখিতে পাইলেন।

স্নায়ুপেশী শক্ত করিয়া স্যর জন্ ঘড়ির দিকেই তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার চিন্তার গগনলেহী স্পর্ধা যেন তাঁহার মনকে ক্ষণকালের জন্য অসাড় ও স্তম্ভিত করিয়া দিল। তারপর তিনি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ঘরে কেহ থাকিলে লক্ষ্য করিত তাঁহার দুই হাত ও হাঁটু থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

স্খলিতপদে স্যর জন্ কয়েকবার ঘরের কার্পেট-ঢাকা মেঝের উপর পায়চারি করিলেন, তারপর হঠাৎ ফিরিয়া ঘরের কোণের দিকে গেলেন। ঘরের কোণে একটি ছোট টেবিলের উপর টেলিফোন ছিল, স্যর জন্ কম্পিত হস্তে তাহা তুলিয়া লইলেন।

পার্লমেণ্টে তখন গণসভার অধিবেশন চলিতে ছিল। স্যর জন্ প্রায় পনেরো মিনিট অপেক্ষা করিবার পর টেলিফোনের অপর প্রান্তে গলার আওয়াজ শোনা গেল। বিব্রত অধীর কণ্ঠস্বর বলিল,—'হ্যালো স্যর জন্? এত রাত্রে কি হ'ল আপনার?'

স্যর জন্ ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন,—'কে, উনি? শোনো, তোমার সঙ্গে ভয়ানক জরুরী কথা আছে—'

বিব্রত কণ্ঠস্বর বলিল,—'কিন্তু এখন যে আমি ভারি ব্যস্ত, দশমিনিট পরে বক্তৃতা দিতে হবে। নতুন গভর্মেণ্ট ভারতবর্ষের কালা আদমিগুলোকে নাই দিয়ে মাথায় তুলেছে—তার বিরুদ্ধে বক্তৃতা—'

স্যর জন্ বলিলেন,—'চুলোয় যাক তোমার বক্তৃতা—যেমন আছ তেমনি চলে এস। খবর আছে—বিরাট বিপুল খবর। এত বড় খবর পৃথিবীতে কেউ কখনও শোনেনি—'

ওদিকে কণ্ঠস্বর এবার আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল,—'কী খবর? কিসের খবর?'

একটু নীরব থাকিয়া স্যর জন্ বলিলেন,—'আমি মানুষের মুক্তিপথ খুঁজে পেয়েছি—শাদা মানুষের মুক্তিপথ—'

তাঁহার গলা কাঁপিয়া গেল।

৫ জানুয়ারী ১৯৪৭

ইংলণ্ডে একটি সংবাদপত্রের রবিবাসরীয় সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। সংবাদপত্রটি মধ্যমশ্রেণীর একটি টোরী পত্রিকা। প্রবন্ধ লেখক একজন খ্যাতিমান সাংবাদিক; অবসরকালে রাজনীতি সম্বন্ধে খেয়ালী জল্পনামূলক অপিচ বিজ্ঞান-গন্ধী নিবন্ধ লিখিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

তাঁহার বর্ত্তমান রচনাটি সংক্ষেপে এইরূপ—

'মানুষের বিজ্ঞানবুদ্ধি তাহার বিবেকবুদ্ধিকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। ফলে সে আরাম বিলাস ও ভোগের বহু নূতন উপাদান পাইয়াছে, শত্রু ধ্বংস করিবার বহু ভয়ঙ্কর অস্ত্রলাভ করিযাছে; তাহার জীবন উপভোগ করিবার লালসা শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু তদনুপাতে পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া ভ্রাতৃভাবে বাস করিবার কোনও উদ্যমই দেখা যায় না। খৃষ্টের অনুশাসন মানুষের জীবনে ব্যর্থ হইয়াছে।

'ইহা রূঢ় সত্য; ইহাকে এড়াইবার উপায় নাই। সুতরাং সত্যকে সহজভাবে স্বীকার করিয়া সতর্কতার সহিত তাহার সম্মুখীন হওয়াই সমীচীন। মানুষের পশুমূলক জৈববৃত্তি দেড় লক্ষ বৎসরের কর্ষণের ফলেও যখন উন্মূলিত হয় নাই তখন আগামী দু'চার বছরে যে নির্মূল হইবে এমন সম্ভাবনা সুদূর পরাহত বলিয়াই মনে হয়। কোনও কোনও দিব্যদর্শী

মননশীল ব্যক্তি মনে করেন মনুষ্যজাতি সমষ্টিগতভাবে অচিরাৎ ধ্বংস-প্রাপ্ত হইবে।

'মনুষ্য সম্প্রদায় কয়েকটি বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইয়া পৃথিবীপৃষ্ঠের ভিন্ন ভিন্ন ভূভাগ দখল করিয়া আছে। ইহাদের মধ্যে ক্রমাগত সংঘর্ষ চলিতেছে; যে জাতি ছোট সে বড় হইতে চায়, যে বড় সে আরও বড় হইতে চায়, ভূমির ক্ষুধা ইহাদের কিছুতেই মিটিতেছে না।'

'ইহার অর্থ কি? কোন্ নিগূঢ় প্রবৃত্তি জাতিকে জাতির বিরুদ্ধে, এমন মারাত্মক ভাবে হিংস্র করিয়া তুলিয়াছে? সকলেই জানে এই বিস্তীর্ণা পৃথিবীতে সকলের জন্যই পর্যাপ্ত স্থান আছে—যৌথভাবে কাজ করিলে সকলের জন্যই প্রভূত খাদ্য উৎপন্ন করা যায়—তবু কেন এই মারামারি হানাহানি?'

'বর্তমান যুগের বুদ্ধিজীবী মানুষ বোধহয় বুঝিতে পারিয়াছে যে পৃথিবী বিস্তীর্ণা হইলেও সীমাহীন নয়; মানুষের জনসংখ্যা যে-হারে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীতে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিবার স্থানাভাব ঘটিবে। মানুষের নিশ্বাস পৃথিবীর সমস্ত বাতাস শুষিয়া লইবে।······

'অন্যকে নিহত করিয়াও নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবার প্রবৃত্তি জীবের সহজাত। এমন কি, আত্মরক্ষার জন্য হত্যা করার অধিকার প্রত্যেক সভ্য-জাতির আইনে স্বীকার করা হইয়াছে। ইহা মানুষের অবিসম্বাদী অধিকার।······

'প্রত্যেক জাতি এই মৌলিক অধিকার রক্ষা করিবার জন্য অপর সকল জাতিকে বিদ্বেষ করিতেছে, তাহাদের বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। আণবিক বোমা আবিষ্কৃত হইয়াছে; আরও ভয়ঙ্কর অস্ত্র

ক্রমে আবিষ্কৃত হইবে। হয় তো ইতিমধ্যে গোপনে গোপনে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং অন্ধ হানাহানির ফলে সমগ্র মানবজাতি যে সমূলে বিনষ্ট হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। দিব্যদর্শী পণ্ডিতের ভবিষ্যদ্বাণীই ফলিবে।

'ইহার কি প্রতিকার নাই? পৃথিবী হইতে মানুষের বিলোপ কি অনিবার্য? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে হইবে। বুদ্ধ যীশু গান্ধীর পথে চলিবার আর সময় নাই। ভাবালুতার বাষ্পোচ্ছ্বাসে এই সমস্যাকে ঘোলা করিয়া তোলাও নিরাপদ নয়; বিজ্ঞান যে-সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে বিজ্ঞানের নির্মোহ দৃষ্টি দিয়াই তাহাকে পরীক্ষা করিতে হইবে!

'ইহা কূট-বাক্য (paradox) বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর জনসংখ্যা কমানোই মানুষকে বাঁচাইয়া রাখিবার একমাত্র উপায়।......জন্ম নিয়ন্ত্রণের দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধিতে হইতে পারিত, কিন্তু কোনও জাতিই সজ্ঞানে নিজ জনসংখ্যা কমাইতে সম্মত হইবে না। পৃথিবী জুড়িয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিবার জন্য রেষারেষি চলিতেছে।

'জনসংখ্যা কমাইবার দ্বিতীয় উপায়—কোনও কোনও বিশেষ জাতিকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সমূলে উচ্ছেদ করিয়া ফেলা। সমগ্রের কল্যাণে অংশকে বিনাশ করা নৈতিক অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হয় না; মানুষের জীবন রক্ষার জন্য অনেক সময় অস্ত্রোপচার করিয়া তাহার হাত-পা কাটিয়া ফেলিতে হয়।......

'এখন প্রশ্ন এই: কাহাকে রাখিয়া কাহাকে নিঃশেষ করিয়া ফেলা যাইতে পারে?

'আধুনিক বিজ্ঞান পাশ্চাত্য শ্বেতজাতির সৃষ্টি; এই বিজ্ঞান মানুষকে যে-শক্তি দিয়াছে বর্তমানে একমাত্র শ্বেতজাতিই তাহার অধিকারী।

অতএব জীবনযুদ্ধে বাঁচিয়া থাকিবার নিঃসংশয় দাবী যদি কাহারও থাকে তো সে শ্বেতজাতির। বসুন্ধরা বীরভোগ্যা।

'পৃথিবী হইতে বর্ণযুক্ত জাতি—কৃষ্ণ পীত বাদামী মিশ্র—যদি বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া যায়, তবে পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ ভূমি শূন্য হইয়া যাইবে। অসুবিধা হয়তো কিছু ঘটিবে, কিন্তু সুবিধার তুলনায় তাহা অকিঞ্চিৎকর। প্রধান কথা, মনুষ্য জাতি—অত্যন্ত তাহার একটা অংশ—রক্ষা পাইবে। জৈব আইনের ধারা survival of the fittest—অব্যাহত থাকিবে। মানুষে মানুষে ভূমি লইয়া কাড়াকাড়ির আর প্রযোজন থাকিবে না। বর্ণ-সমস্যা থাকিবে না। অত্যন্ত দুই হাজার বৎসরের মধ্যে মানুষের আর নির্বাণ প্রাপ্তির ভয় থাকিবে না।

'এই দুই হাজার বৎসরে মানুষ কি নিজেকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিবে না ?'

—প্রবন্ধটি পাঠক মহলে কিছু আলোচনার সৃষ্টি করিল বটে কিন্তু অধিকাংশ পাঠকই উহা খেয়ালী কল্পনার উদ্ভট বিলাস মনে করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিল।

ইহার পর প্রায় দেড় বৎসর কাটিয়া গেল। সংবাদপত্র পাঠকের স্মৃতি স্বভাবতই হ্রস্ব হইয়া থাকে, প্রবন্ধটির কথা আর কাহারও মনে রহিল না।

অতঃপর পৃথিবীর নানা দেশে যে-সব ঘটনা ঘটিতে আরম্ভ করিল তাহাই সংক্ষেপে বিভিন্ন তারিখের শিরোনামায় বর্ণিত হইল।

২৫ জুন ১৯৪৮

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে তারযোগে রয়টারের ভয়াবহ সংবাদ আসিয়াছে। সমস্ত ভারতবর্ষ ভয়ে ও বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছে।

সকলেই জানেন, আমেরিকার নিগ্রোরা গত দুই বৎসরের অক্লান্ত আন্দোলনের ফলে নিজেদের জন্য একটি স্বতন্ত্র ষ্টেট বা রাষ্ট্র স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে; এই ষ্টেট আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উনপঞ্চাশ সংখ্যক রাষ্ট্র বলিয়া পরিচিত! আরিজোনা ও মেক্সিকোর সীমান্তে এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটি স্থাপিত হইয়াছে।

গত ছয় মাস ধরিয়া আমেরিকার সমস্ত নিগ্রো তাহাদের এই নূতন রাষ্ট্রে গিয়া সমবেত হইয়াছে; নিগ্রোজাতির আনন্দের সীমা নাই। গতকল্য তাহাদের নবগঠিত রাজধানীতে প্রথম রাষ্ট্র পরিষদের অধিবেশন ছিল। রাজধানীর জনসংখ্যা হইয়াছিল প্রায় দশলক্ষ।

অতঃপর রয়টারের যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাই বিবৃত হইল—

সান্ ফ্রন্সিস্‌কো, জুন ২৪। নবনির্মিত নিগ্রো ষ্টেট মেক্‌সারিজ (Mexariz)য়ের রাজধানী হইতে একটি শোচনীয় দৈব দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। দ্বিপ্রহরে যে-সময় রাষ্ট্র-সভার বৈঠক বসিয়াছিল, সেই সময় রাজধানীর উপর দিয়া একটি Fortress শ্রেণীর এরোপ্লেন উড়িয়া যাইতেছিল। এরোপ্লেনে কয়েকটি আণবিক বোমা ছিল; এই নবাবিষ্কৃত ভীষণ শক্তিশালী বোমাগুলি পরীক্ষার জন্য প্রশান্ত মহাসাগরের কোনও দ্বীপে লইয়া যাওয়া হইতেছিল। এরোপ্লেনে মানুষ কেহ ছিল না; উহা রেডিও দ্বারা পরিচালিত হইতেছিল। দৈবাৎ এরোপ্লেনের যন্ত্র বিগড়াইয়া যায় এবং কোনও অজ্ঞাত কারণে আণবিক বোমাগুলি ফাটিয়া পড়ে।

অনুমান হয়, এই বিষম বিস্ফোরণের ফলে রাজধানীতে কেহই জীবিত নাই। নানা জাতীয় প্রাণঘাতী রশ্মি-বিকিরণের জন্য ঐ স্থান এখন মানুষের পক্ষে সুগম নয়। দূর হইতে এরোপ্লেন যোগে পরিদর্শনের

ফলে জানা গিয়াছে যে নবরচিত রাজধানী একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে।

*   *   *   *

৩০ জুন ১৯৪৮

গত কয়েকদিন আমেরিকা হইতে আণবিক বোমা বিস্ফোরণ সম্বন্ধে আর কোনও নূতন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। মনে হয় আমেরিকায় সংবাদের উপর কড়া Censorship বসিয়াছে। রাশিয়ার টাস্ এজেন্সি কিন্তু নিম্নরূপ খবর দিয়াছে—

"আমেরিকায় সম্প্রতি যে দারুণ দুর্ঘটনা হইয়াছে তাহার ফলে আন্দাজ দশলক্ষ নিগ্রো মরিয়াছে। কিন্তু এ ব্যাপার সম্বন্ধে আরও একটি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহা আরও চাঞ্চল্যকর। যে নূতন আবিষ্কৃত আণবিক বোমাগুলি ফাটিয়া এই বিপত্তি ঘটে, জানা গিয়াছে সেই বোমায় নাকি এক প্রকারের নূতন রশ্মি বিকিরণের উপাদান ছিল; বোমা বিস্ফোরণের দেড়শত মাইলের মধ্যে সকল মানুষকে এই রশ্মি প্রভাবিত করিবে। জীবদেহে এই রশ্মির ফল—যাহারা আক্রান্ত হইয়াছে তাহারা আর বংশবৃদ্ধি করিতে পারিবে না।

"মেক্সিকোর অধিকাংশ অধিবাসীও এই অভিনব রশ্মি দ্বারা প্রভাবিত হইবে।"

পূর্বোক্ত সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রের গভর্মেণ্ট অস্বীকার করিয়াছেন।

১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮

দক্ষিণ আফ্রিকার শাদা কালো বিরোধ এতদিনে সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন হইল; এজন্য প্রধানত ইংলণ্ডের গণতান্ত্রিক মন্ত্রীমণ্ডলই প্রশংসার্হ। বৃটিশ কমন্ওয়েল্‌থ্‌কে দীর্ঘায়ু করিবার ন্যায়নিষ্ঠ পন্থা এতদিনে অবলম্বিত হইল।

ইংলণ্ডের অক্লান্ত চেষ্টা ও উদ্যমের ফলে অষ্ট্রেলিয়া কানাডা প্রভৃতি কমন্‌ওয়েল্‌থের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্র সমূহের একটি বৈঠক হইয়া গিয়াছে। তাহাতে স্থির হইয়াছে : দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী সমস্ত শ্বেতাঙ্গ জাতির লোক অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়া বসতি স্থাপন করিবে : দক্ষিণ আফ্রিকা অতঃপর স্থানীয় জাতি ও উপনিবেশী হিন্দুস্থানিগণ কর্তৃক শাসিত হইবে। আগামী দশ বৎসর ধরিয়া শ্বেতাঙ্গগণ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পাঁচ লক্ষ তোলা সোনা পাইবে।

এই সকল সর্তে আফ্রিকার আদিম অধিবাসিরা এবং ভারতীয় উপনিবেশীরা আনন্দের সহিত স্বীকার করিয়াছে।

সাউথ আফ্রিকা হইতে শ্বেতাঙ্গ দলের রপ্তানি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গের জনসংখ্যা মুষ্টিমেয় ; আশা করা যায় মাস খানেকের মধ্যে আফ্রিকায় আর শ্বেতাঙ্গ থাকিবে না।

দেখা যাইতেছে, পাশ্চাত্য দেশের রাজনৈতিক চিন্তাধারা এখন ভিন্নমুখী হইয়াছে ; এসিয়াখণ্ডে—অষ্ট্রেলিয়া ছাড়া—অন্য কোনও দেশে তাহারা উপনিবেশ বা অধিকার রাখিতে চাহে না। তাহাদের এই নূতন মনোবৃত্তি অতীব প্রশংসনীয়।

২৫ ডিসেম্বর ১৯৪৮

গত কয়েকমাসে পাশ্চাত্য দেশ হইতে প্রাচ্যদেশে সংবাদ সরবরাহ অনেক কমিয়া গিয়াছে। বোধ হয় সকল পাশ্চাত্য দেশেই সংবাদের উপর Censorship বসিয়াছে। দেড় বৎসর আগে নিগ্রোদের নূতন রাষ্ট্রে বোমা বিস্ফোরণের পর যে বিপুল হৈ চৈ হইয়াছিল, তাহারই ফলে বোধ হয় পাশ্চাত্য দেশের শাসক সম্প্রদায় সাবধান হইয়াছেন।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সাউথ আফ্রিকা হইতেও সমস্ত খবর আসা বন্ধ

হইয়া গিয়াছে। একমাস হইতে রেডিও কেন্দ্রগুলি পর্যন্ত বন্ধ। সেখানে কী হইতেছে কেহ জানেনা।

তবু, অতর্কিতে দু' একটি খবর বাহির হইয়া পড়ে। সম্প্রতি ভারতবর্ষে একটি উদ্বেগজনক সংবাদ পৌছিয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকায় নাকি এক প্রকার অদ্ভুত মারীভয় দেখা দিয়াছে। সহজ স্বাস্থ্যবান মানুষ রাস্তায় চলিতে চলিতে হঠাৎ পড়িয়া মরিয়া যাইতেছে! রোগের কোনও লক্ষণই এপর্যন্ত ধরিতে পারা যায় নাই। উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কোনক্রমে বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই মহামারীকে পানামা কানালের পরপারে ঠেকাইয়া রাখিযাছে।

মহামারী কিন্তু অন্যদিকে প্রসার লাভ করিয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগর ডিঙাইয়া ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে দেখা দিয়াছে। আন্তর্জাগতিক সমিতি সমুদ্রের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে কেয়ারাণ্টাইন্ বসাইয়া এই মারীর প্রসার রোধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

১ জানুয়ারী ১৯৪৯

ইংলণ্ডেশ্বর ভারতবাসীকে তাহাদের স্বাধীনতা লাভের প্রথম বৎসর পূর্ণ হওয়ায় অভিনন্দন জানাইয়াছেন।

আর একটি সুখবর আছে। এতদিন, ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়া সত্বেও অনেক ইংরেজ এদেশে বাস করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতেছিলেন। আজ ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভা ভারত-প্রবাসী ইংরেজের উপর এক হুকুম জারি করিয়াছেন: আগামী একমাসের মধ্যে সমস্ত ইংরেজকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইতে হইবে, অন্যথায় বৃটিশ জাতিত্ব হইতে তাহারা খারিজ হইয়া যাইবে। ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের সম্প্রীতি রক্ষার উদ্দেশ্যেই এই আদেশ প্রচারিত হইয়াছে।

৩১ জানুয়ারী ১৯৪৯

করাচি বোম্বাই ও কলিকাতার বন্দর হইতে আজ য়ুরোপগামী শেষ জাহাজ ছাড়িল; ভারতবর্ষে যে-কয়জন ইংরেজ অবশিষ্ট ছিল তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া গেল। ফরাসী ও পোর্তুগীজরা ইতিপূর্বেই ভারত ত্যাগ করিয়াছে।

এতদিনে ভারতবর্ষ কার্যতঃ স্বপ্রতিষ্ঠ স্বয়ংপ্রভু হইল। ইংরেজ শেষের দিকে সত্যই আমাদের সঙ্গে সদ্‌ব্যবহার করিয়াছে।

৭ মার্চ ১৯৪৯

স্যর জন্ হোয়াইট তিরাশী বৎসর বয়সে নোবেল প্রাইজ লাভ করিয়াছেন।

স্যর জন্ সাংবাদিকমণ্ডলীকে বিবৃতি দিয়াছেন—জীবনের শেষ পঞ্চাশ বৎসর আমি মানব জাতির সেবায় অতিবাহিত করিয়াছি—এই পুরস্কারের টাকাও আমি সেই উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিলাম···আমার দিন ফুরাইয়া আসিতেছে তথাপি আমি আশা করি মৃত্যুর পূর্বে মানুষের পরম পরিত্রাণ দেখিয়া যাইতে পারিব।

১৫ মে ১৯৪৯

মহামারীকে আটকাইয়া রাখা গেলনা। চীন ও বর্মায় মহামৃত্যুর ডঙ্কা বাজিয়া উঠিয়াছে। পথে ঘাটে মানুষ মরিতেছে। বসিয়া বসিয়া মানুষ মরিয়া যাইতেছে। রেঙ্গুনে একদিনে সাত হাজার লোক মরিয়াছে!

ভারতবর্ষের জাতীয় গভর্মেণ্ট চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে এই নামহীন মৃত্যু এদেশে প্রবেশ করিতে না পারে।

৭ জুন ১৯৪৯

আজ কলিকাতা সহরে একটি ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রাতঃকালে আন্দাজ

দশটার সময় একটি ট্যাক্সি দেশবন্ধু অ্যাভেন্যু দিয়া যাইতেছিল; পথের মাঝখান দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ ট্যাক্সি পাশের দিকে ফুটপাথের উপর উঠিয়া একটি বালককে চাপা দিয়া দেয়ালে আঘাত করে। বালকের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়; কিন্তু ট্যাক্সির বেগ তাহাতেও শান্ত হইল না; দেয়ালে প্রতিহত হইয়া পিছন দিকে কিছুদূর ফিরিয়া আসিয়া ট্যাক্সি আবাব দেযাল আক্রমণ করিল। এবার আর ট্যাক্সি ফিরিয়া আসিল না, ইঞ্জিন বন্ধ হইয়া যাওয়ায় সেইখানেই দাঁড়াইয়া পড়িল।

পথচারীরা এতক্ষণ সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল, এবার ক্রোধান্ধভাবে ছুটিয়া গিয়া ট্যাক্সি চালককে টানিয়া গাড়ী হইতে বাহির করিল। দেখা গেল, দেহ সম্পূর্ণ অক্ষত হইলেও তাহার দেহে প্রাণ নাই…

৯ জুন ১৯৪৯

কলিকাতার লোক পালাইতে আরম্ভ করিয়াছে; মৃত্যুভয়ে উন্মত্ত হইয়া যে যেদিকে পারিতেছে পালাইতেছে। কিন্তু পালাইয়া যাইবে কোথায়? করাল মৃত্যুর বিষ দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে…বোম্বাই মাদ্রাজ লাহোর সর্বত্র এক অবস্থা…হাহাকার করিয়া মানুষ চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে; কখন কাহার ললাটে মরণ-কাঠির স্পর্শ লাগিবে কেহ জানে না…

মাছির মত মানুষ মরিতেছে; সৎকার করিবার কেহ নাই। শীঘ্রই এই বিশাল ভারতভূমি শ্মশানের মত শূন্য হইয়া যাইবে। কেবল যাহা নির্জীব, যাহা ইট-কাঠ-পাথরে তৈরি তাহাই থাকিয়া যাইবে।

৬ আগষ্ট ১৯৫০

পৃথিবীর সবর্ণ জাতির আর একটি মানুষও বাঁচিয়া নাই। তাহাদের অস্থি-কঙ্কালে সমস্ত পৃথিবী শাদা হইয়া গিয়াছে।

লণ্ডনে একটি মহতী সভা আহ্বান করিয়া স্যর জন্ হোয়াইটকে সম্বর্ধনা করা হইয়াছে।

সভাস্থলে বিপুল আনন্দধ্বনির মধ্যে ঋষিকল্প বৃদ্ধ স্যর জন্ উঠিয়া বলেন—বিজ্ঞান বিশ্বপ্রকৃতির দর্পণ, এই দর্পণে আমরা প্রকৃতির স্বরূপ দেখিতে পাই। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে দয়া মায়ার স্থান নাই; যে যোগ্য সেই বাঁচিয়া থাকে, যে অনধিকারী তাহার বাঁচিবার দাবী নাই। প্রকৃতির দরবারে আমাদের শ্বেত জাতির বাঁচিয়া থাকিবার দাবী মঞ্জুর হইয়াছে—'

এই পর্যন্ত বলিয়া স্যর জন্ থামিয়া গেলেন; তারপর সহসা ধরাশায়ী হইলেন। দেখা গেল তাঁহার দেহে প্রাণ নাই।

বিরাট সভা কয়েক মুহূর্তের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। এই স্তম্ভিত নীরবতার মধ্যে বিগ্ বেন্ ঘড়িতে মন্দ্র-মন্থর শব্দে তিনটা বাজিল।

ভাগ্যবন্ত

শরৎকালের আরম্ভে সাঁওতাল পরগণার প্রাকৃতিক অবস্থা বড়ই মনোরম হয়। কোনও তাপদিগ্ধা সুন্দরী সায়াহ্নকালে অপর্য্যাপ্ত জলে সাবান মাখিয়া স্নান করিবার পর দেহে ও মনে যেরূপ একটি শুচিস্নিগ্ধ লঘু প্রসন্নতা অনুভব করেন, এ যেন কতকটা সেইরূপ।

দিবা চলিয়া গিয়াছে, রাত্রি এখনও আসে নাই, মাঝের সন্ধিস্থলটি পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে শান্ত সোনালী একটি নিশ্চিন্ততা। এমনি সায়াহ্নে সাঁওতাল পরগণার নির্জ্জন কঙ্করাকীর্ণ পথ দিয়া এক পথিক চলিয়াছিলেন। মাইলখানেক দূরে একটি শহর আছে, পথিকের গতি সেইদিকে। তাঁহার বয়স অনুমান পঞ্চাশ বৎসর; পরণে গেরুয়া আলখাল্লা, মুখে প্রচুর দাড়িগোঁফ, মাথায় রুক্ষ দীর্ঘ চুল—চোখের দৃষ্টিতে একটি মিষ্ট হাসি লাগিয়া আছে।

চলিতে চলিতে তিনি গুন্‌গুন্‌ করিয়া গান গাহিতেছেন—

"আমার—কাজ ফুরলো ঘুচলো রে মোর চিন্তা!
এবার আমি গাইব রে গান নাচব তাধিন্‌ ধিন্‌তা।
কাজের বোঝা, ভাবনা-ভাবার দায়
ঠাকুর—এই রইল তোমার পায়,
এখন থেকে—খাটবে তুমি, ভাববে তুমি,
আমি—নাচব তাধিন্‌ ধিন্‌তা।"

তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার গান শুনিয়া মনে হয়, এই শরৎ-সন্ধ্যার মত তিনিও অন্তরে একটি লঘু নিশ্চিন্ত প্রসন্নতা লাভ করিয়াছেন।

পথের দুইপাশে শালবন। সহরের এলাকা এখনও আরম্ভ হয় নাই। পথিক মন্থরপদে চলিতে চলিতে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার গানও থামিল। শালবনের ফাঁকে অপ্রত্যাশিত একটি বাড়ী—পাচিল দিয়া ঘেরা ছোটখাট সুন্দর একটি বাংলো।

বাংলোর সম্মুখে বাঁধানো চাতালের উপর দুইটি ইজি-চেয়ার পাতা রহিয়াছে, তাহার একটিতে মধ্যবয়স্ক টাক-মাথা একজন ভদ্রলোক বসিয়া নিবিষ্ট মনে খবরের কাগজ পড়িতেছেন।

পথিক ক্ষণেক দাঁড়াইয়া চিন্তা করিলেন। তাঁহার পা দুটি ক্লান্ত, আজ সমস্তদিন হাঁটিয়াছেন; যদি রাত্রির মত এইখানেই আস্তানা মিলিয়া যায় মন্দ কি? তিনি ফটক খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

গৃহস্বামী খবরের কাগজে মগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন, হঠাৎ সম্মুখে আগন্তুক দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন,—'কে? কি চাই?'

পথিক সবিনয়ে বলিলেন,—'আজ রাত্রির জন্যে আশ্রয় দেবেন কি? কাল সকালেই আমি চলে যাব।'

গৃহস্বামী ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিস্ময়োৎফুল্ল নেত্রে পথিকের পানে চাহিয়া রহিলেন। এই কয়েকটি কথা শুনিয়াই তাঁহার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, আগন্তুক ভেকধারী হইলেও আদৌ তাঁহারই সমশ্রেণীর বাঙালী ভদ্রলোক। বহুদিন অজ্ঞাতবাসের ফলে সমশ্রেণীর লোকের সহিত মেলামেশার সুযোগ তাঁহার ঘটে না। তিনি সাগ্রহে বলিলেন,—'নিশ্চয়, নিশ্চয়! আসুন—বসুন! আপনি তো ভদ্রলোক, মশাই; সাধু-সন্ন্যিসিদের মধ্যে ভদ্রলোক বড় দেখা যায় না। মানে—'

সন্ন্যাসী ঝুলি নামাইয়া অন্য চেয়ারটির প্রান্তে বসিলেন, একটু হাসিয়া বলিলেন,—'ভদ্রলোক ছিলাম অনেকদিন আগে, এখন ওসব হাঙ্গামা চুকে গেছে।'

গৃহস্বামী একটু অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন, পুনশ্চ উপবেশন করিয়া বলিলেন,—'হেঁ হেঁ,—ও হাঙ্গামা চুক্‌লেই ভাল। তা চায়ের অভ্যাস আছে কি?'

'এখন আর নেই—তবে আপনি দিলে খাব।'

'বেশ, বেশ। ওরে ঝড়ুয়া—'

গৃহস্বামীর হাঁকের উত্তরে, ঝড়ুয়ানামক সাঁওতাল ভৃত্যের পরিবর্ত্তে একটি স্ত্রীলোক বাংলো হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোক, ভারিভুরি গড়ন; মুখখানি গোলাকৃতি, বড় বড় তীব্র-চাহনি-যুক্ত চোখে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি, কপালে ডগডগে সিঁদুরের ফোঁটা। তাঁহার গায়ে ভারি ভারি সোনার গহনা, পরণে চওড়া-পাড় শান্তিপুরে শাড়ী। তিনি যৌবনকালে তন্বী ও রূপসী ছিলেন তাহা অনুমান করা যাইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমানে মেদ ও বয়সের তলায় রূপ-লাবণ্য চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

বাড়ীর বাহিরে পা দিয়া সন্ন্যাসীকে দেখিয়াই তিনি থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন, তারপর দ্রুত ফিরিয়া গিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিলেন। দরজার আড়াল হইতে রুক্ষ রুষ্ট স্ত্রীকণ্ঠ শোনা গেল,—'এসব আবার কি! মাথায় চুল নেই, কপালে তেলক। সাধু-সন্নিসি নিয়ে ঢঙ্‌ আরম্ভ হয়েছে—'

গৃহস্বামীর টাক ও মুখ অরুণাভ হইয়া উঠিল, তিনি ত্বরিতে উঠিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সন্ন্যাসী বসিয়া মিটি মিটি হাসিতে লাগিলেন, যেন তিনি মনে মনে বলিতেছেন,—কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।

খানিক পরে গৃহস্বামী ফিরিয়া আসিতেই সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহজ বিনয়ের কণ্ঠে বলিলেন,—'আপনার যদি অসুবিধে হয় আমি যাচ্ছি। শহর বেশী দূর নয়, কোথাও রাত কাটিয়ে দিতে পারব।'

গোঁ-ভরে মাথা নাড়িয়া গৃহস্বামী বলিলেন, 'না, আজ এখানেই থাকুন।—চা আসছে।'

সন্ন্যাসী আবার বসিলেন। মনে মনে আমোদ অনুভব করিলেও গৃহস্বামীর প্রতি তাঁহার অন্তরে একটু সহানুভূতিরও সঞ্চার হইল। বেচারা সংসারী! লোকটি সদাশয়, কিন্তু অন্দরমহলের প্রবল শাসনে নিজের সত্তা হারাইয়া ফেলিয়াছেন, মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করিয়া মাথা তুলিতে চান, এই পর্যন্ত। লোকটি অবস্থাপন্ন তাহা দেখিলেই বোঝা যায়, তবে কেন লোকালয় ছাড়িয়া নির্জনে বাস করিতেছেন কে জানে! জীবনসঙ্গিনীটি সম্ভবতঃ রণচণ্ডী খাণ্ডার—আহা বেচারা।

সোনালী সন্ধ্যা ক্রমে রূপালী রাত্রে পরিণত হইল। আজ বোধ হয় শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথি, মাথার উপরে আধখানা চাঁদ নীচের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল।

গৃহস্বামী গুম হইয়া বসিয়াছিলেন। ভৃত্য আসিয়া দুই পেয়ালা চা ও শালপাতার ঠোঙায় জলখাবার রাখিয়া গেল। এতক্ষণে ঈষৎ সজীব হইয়া গৃহস্বামী একটা পেয়ালা তুলিয়া লইয়া বলিলেন,—'নিন, জলযোগ করুন।'

নীরবে জলযোগ ও চা-পান চলিতে লাগিল। বাড়ীর ভিতরে তখন কেরোসিন-আলো জ্বলিয়াছে। হঠাৎ ভিতর হইতে রৈ রৈ শব্দে কে গান গাহিয়া উঠিল। প্রথমটা চমকিয়া উঠিয়া সন্ন্যাসী বুঝিলেন, সজীব মানুষের গলা নয়, কলের গান। অন্তরালবর্ত্তিনী গ্রামোফোন বাজাইয়া বোধ করি নিজের চিত্তবিনোদন করিতেছেন।

অরণ্যানীর জ্যোৎস্না-নিষিক্ত নীরবতার উপর এ যেন পাশবিক দৌরাত্ম্য। এর চেয়ে শেয়াল-ডাকও শ্রুতিমধুর—অন্ততঃ স্থানকালের অধিক উপযোগী। সন্ন্যাসী আড়চোখে চাহিয়া দেখিলেন, গৃহস্বামীর মুখ হতাশাপূর্ণ বিরক্তিতে কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে; সম্ভবতঃ প্রত্যহ সন্ধ্যায় এই রেকর্ড-সঙ্গীত তাঁহাকে শুনিতে হয়।

একটু কুণ্ঠিতভাবে তিনি বলিলেন,—'কৈ, আপনার বাড়ীতে ছেলেপুলে—?'

'ছেলেপুলে নেই—আমি নিঃসন্তান—' গৃহস্বামী চায়ের খালি পেয়ালা নামাইয়া রাখিয়া নিজের চেয়ার সন্ন্যাসীর দিকে একটু সরাইয়া লইয়া বসিলেন, একটু অন্তরঙ্গভাবে প্রশ্ন করিলেন,—'আচ্ছা, কিছু মনে করবেন না, আপনি কতদিন এই—মানে—এই গৃহত্যাগ করেছেন?'

সন্ন্যাসী চিন্তা করিয়া বলিলেন,—'তা প্রায় বছর পঁচিশ হ'তে চল্‌ল।'

'কিছু পেয়েছেন কি?'

সন্ন্যাসী একটু চুপ করিযা বলিলেন,—'যোগসিদ্ধি বা বিভূতির কথা যদি বলেন, তাহলে কিছু পাইনি। তবে একটা জিনিষ পেয়েছি—শান্তি।'

সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া গৃহস্বামী ইজিচেয়ারের উপর চিৎ হইয়া চাঁদের পানে চাহিয়া রহিলেন। অনুমান পঁচিশ বছর আগে তাঁহার জীবনেও একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, তবে তাহা সন্ন্যাসগ্রহণের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারপর প্রথম কিছুদিন মন্দ কাটে নাই। কিন্তু ক্রমে এই পঁচিশ বছরে পুষ্পমালা নিগড় হইয়া উঠিয়াছে। শান্তি! জীবনে এক মুহূর্তের জন্যও তিনি শান্তি পাইয়াছেন কি? হঠাৎ গৃহস্বামী হা হা করিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। হাঁ, শান্তি তিনি পাইয়াছেন বৈ কি!

শান্তি-নামধারিণী একটি রমণী গত পঁচিশ বছর ধরিয়া এমন দৃঢ়ভাবে তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া আছেন যে, কে বলিবে তিনি শান্তি পান নাই ! অদৃষ্ট এমন ইতর পরিহাসও করিতে পারে !

ঘরের মধ্যে তখন গ্রামোফোনের খোনা আওয়াজে কীচক-বধ পালা অভিনয় হইতেছে।

গৃহস্বামী উঠিয়া বসিয়া ব্যঙ্গ-তিক্ত কণ্ঠে বলিলেন,—'শুনতে পাচ্ছেন ! ওদিকে কীচক-বধ সুরু হয়েছে। এদিকে আমি যে সারাজীবন ধরে' কীচক-বধ হচ্ছি তা কেউ বুঝল না। কিন্তু আপনি সাধু-বৈরিগি লোক, আমার পাপতাপের কথা শুনিয়ে আপনার শান্তি নষ্ট করব না। তার চেয়ে আপনার কথাই বলুন শুনি। আপনি কেন সংসার ছাড়লেন, কি করে শান্তি পেলেন, যদি বাধা না থাকে আমায় বলুন।'

সন্ন্যাসী হাসিলেন,—'বাধা এখন আর কিছু নেই, বরং মনে পড়লে হাসি পায়। আপনি শুনতে চান বলছি। হয়তো আমার সংসার-ত্যাগের কাহিনী শুনে, আমি কত বড় আঘাত কাটিয়ে উঠেছি জেনে, আপনার কিছু উপকার হতে পারে।'

সন্ন্যাসী নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—'আজ মনে হয়, উমেশ নিয়োগী বুঝি আর কেউ ছিল; আমিই যে উমেশ নিয়োগী একথা এখন বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। দুটো মানুষ আলাদা হয়ে গেছে।'

'উমেশ ছিল যাকে বলে মধ্যবিত্ত লোক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল ছাত্র ছিল, তাই একটা কলেজে দেড়শ'টাকা মাইনের চাকরি পেয়েছিল। কলকাতাতেই থাকত।'

'উমেশের বাড়ীতে এক বুড়ি মা ছিলেন। তিনিও বেশীদিন টিঁকলেন না, উমেশ চাকরি পাবার কিছুদিন পরেই মারা গেলেন।'

'তারপর এক সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ের সঙ্গে উমেশের বিয়ে হল। বংশ সম্ভ্রান্ত হলেও অবস্থা পড়ে গিয়েছিল, তাই বোধ হয় মধ্যবিত্ত উমেশের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। মেয়েটি সুন্দরী বিদুষী—তখনকার দিনের পক্ষে আধুনিকা। একদল অভিজাত-বংশীয় তরুণ বন্ধু সর্ব্বদা তাকে ঘিরে থাকত।'

'উমেশের মনে আনন্দের শেষ নেই ; এমন স্ত্রী অনেক ভাগ্যে পাওয়া যায়। স্ত্রীর বন্ধুরা তারও বন্ধু হয়ে দাঁড়ালো। যাওয়া-আসা খাওয়া-দাওয়া পার্টি-পিকনিক চলতে লাগল। সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে বলে' উমেশের স্ত্রীর হাত ভারি দরাজ ; বাজারে উমেশের কিছু ধার হল। কিন্তু উমেশ তা গ্রাহ্য করলে না। এমনিভাবে প্রায় বছরখানেক কাটল।'

'তারপর হঠাৎ একদিন বিনামেঘে বজ্রাঘাত হল ; একজন তরুণ বন্ধু উমেশের স্ত্রীকে নিয়ে উধাও হলেন।'

সন্ন্যাসী মৃদুকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। গৃহস্বামী গালে হাত দিয়া শুনিতেছিলেন, মুখ না তুলিয়াই বলিলেন,—'তারপর ?'

সন্ন্যাসী বলিলেন,—'তারপর কিছুদিনের জন্যে উমেশ যেন পাগল হয়ে গেল, একটা ছুরি নিয়ে বন্ধুদের বাড়ী-বাড়ী চোরাই মাল খুঁজে বেড়াতে লাগল। মতলবটা এই যে, কে তার বৌ চুরি করেছে জানতে পারলেই তাকে খুন করবে। কিন্তু অভিজাত বংশীয় লোকদের মধ্যে ভারি একতা আছে, তারা কেউ কাউকে ধরিয়ে দেয় না। উমেশ তার বৌ-চোরকে খুঁজে পেলে না।

'ক্রমে তার মনের গতি বদলে গেল। এদিকে পাওনাদারেরা টাকার তাগাদা আরম্ভ করেছিল। মানুষ জাতটার উপরেই উমেশের মন বিষিয়ে গেল ; মনে হল, এমন নিষ্ঠুর পাজি জাত আর নেই। একদিন গভীর রাত্রে লোটা কম্বল নিয়ে সে বেড়িয়ে পড়ল।'

'তারপর ?"

'তারপর আর কি ? পঁচিশ বছর ধরে' সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়েছি। অনেক সাধু-মহাজনের দর্শন পেয়েছি। সাধন ভজন বিশেষ কিছু করিনি, কিন্তু তবু বড় আনন্দে আছি। অভাব যে মানুষের কতটুকু, তা সংসার না ছাড়লে বোঝা যায় না। এতটুকু সংযমের বিনিময়ে কতখানি আনন্দ পাওয়া যায়, এককোঁটা আত্মত্যাগের বদলে কী বিপুল শান্তি পাওয়া যায়—তা আপনাকে কি করে' বোঝাব ? আমার কোন অভাব নেই—আমি বড় আনন্দময় শান্তি পেয়েছি। গৃহী-জীবনের কথা আর মনে পড়ে না—পড়লেও আর কষ্ট হয় না।'

* * * *

আহারাদির পর সন্ন্যাসী একটি ছোট কুঠুরীতে শয়ন করিলেন। বিছানাটি ভারি নরম, এত নরম বিছানায় সন্ন্যাসী অনেকদিন শয়ন করেন নাই ; তিনি অবিলম্বে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

প্রত্যূষে ঘুম ভাঙিয়া সন্ন্যাসী দেখিলেন, শয্যার পাশে একটি চিঠি রাখা রহিয়াছে। তিনি চিঠি খুলিয়া পড়িলেন,—

ভাই উমেশ,

তুমি কাল যে গল্প বলেছিলে তাতে একটু ভুল ছিল। তোমার স্ত্রীকে কেউ চুরি করেনি, তোমার স্ত্রীই তোমার এক বন্ধুকে চুরি ক'রে নিয়ে পালিয়েছিলেন। সে বন্ধুটি আমি।

তুমি আমাদের চিনতে পারনি, তাতে আশ্চর্য্য হইনি, আমাদের সকলেরই চেহারা বদ্‌লে গেছে। গল্প শুনে তোমাকে চিনতে পারলুম। তুমি ভাগ্যবান পুরুষ, তোমাকে নমস্কার।

তোমার স্ত্রীর মতন এমন ভয়ানক, দজ্জাল, সন্দিগ্ধমনা, স্বার্থপর

স্ত্রীলোক পৃথিবীতে আর আছে কিনা আমি জানিনা, কারণ অন্য কোনও স্ত্রীলোকের প্রকৃতি জানবার সুযোগ আমার ঘটেনি। দুনিয়ার লোক আমাকে লম্পট দুশ্চরিত্র বলেই জানে, তাদের চোখে আমি পরস্ত্রী-হরণকারী। কিন্তু ভগবান জানেন, আমার মত একনিষ্ঠ সচ্চরিত্র পুরুষ আর নেই। জীবনে একটা ভুল করেছিলুম, তার জন্যে সমাজ ছেড়েছি, সংসার ছেড়েছি, সন্তানসুখের আশা ছেড়েছি, আমার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি তোমার স্ত্রীর নামে লিখে দিয়েছি। সর্ব্বশেষে তার সন্দেহের জ্বালায় এই বনের মধ্যে বাস করছি। ভাই, আমার যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে, আর না। এবার তোমার সম্পত্তি তুমি নাও। আমি চললুম।

তোমাকে দেখে তোমার কথা শুনে আমার বিশ্বাস হয়েছে যে তুমি শান্তি পেয়েছ; তাই আমারও লোভ হয়েছে চেষ্টা করে দেখি যদি শান্তি পাই। পঁচিশ বছর তোমার 'শান্তি'কে বহন করবার পর এ অধিকার আমার জন্মেছে—আশা করি তুমি স্বীকার করবে।

তোমার আলখাল্লা আর ঝুলিটা নিয়ে চললুম, কিছু মনে কোরো না।

তোমার ধনপতি

মেঘদূত

জ্যৈষ্ঠ মাসের অপরাহ্ণে ব্রতীন মাঠ ভাঙিয়া গ্রামের দিকে চলিয়াছিল। সূর্য প্রায় অস্তোন্মুখ হইয়াছে বটে কিন্তু তাহার চোখের রক্ত-রাঙা ক্রোধ এখনও নিভিয়া যায় নাই।

রৌদ্রে পোড়া চারণভূমি; ঘাস যে দু'চার গাছি ছিল জ্বলিয়া খড় হইয়া গিয়াছে। মাঠে জনপ্রাণী নাই। সম্মুখে প্রায় মাইল খানেক দূরে গ্রামের খোড়ো ঘরগুলি দিগন্ত রেখাকে একটু অসমতল করিয়া দিয়াছে। তাহারই কাছাকাছি একটা নিঃসঙ্গ তালগাছ শূন্যে গলা উঁচু করিয়া যেন দূরের কোনও দৃশ্য দেখিবার চেষ্টা করিতেছে; অবসন্ন মূর্চ্ছাহত দিগন্তের ওপারে শীতলতার কোনও আশ্বাস আছে কিনা তাহারই সন্ধান করিতেছে। ঐ তালগাছটা ব্রতীনের বাড়ীর কাছেই।

তপতীর কথা ব্রতীনের মনে হইল; তপতী হয়তো জানালায় দাঁড়াইয়া তাহার পথ চাহিয়া আছে। ব্রতীন আরও জোরে পা চালাইল। একে তো ঘরমুখো বাঙালী; তার উপর ক্যাম্বিসের জুতার তলা ভেদ করিয়া মাটির উত্তাপ তাহার পায়ের চেটো পুড়াইয়া দিতেছে। সমস্ত দিনের অগ্নিক্ষারণ মাটির কটাহে সঞ্চিত হইয়া টগবগ করিয়া ফুটিতেছে।

ব্রতীন ভদ্রসন্তান; সহরের আবহাওয়ায় লেখাপড়া শিখিয়া সে মানুষ হইয়াছিল। জীবনে বেশী উচ্চাশা তাহার ছিলনা; গতানুগতিকভাবে চাকরি-বাকরি করিয়া সংসার পাতিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইয়া দিবে এইরূপ একটা ভাসা-ভাসা অভিপ্রায় তাহার মনে ছিল। কিন্তু সহসা

একদিন ভাব-বন্যার দুর্নিবার টানে তাহার ঘাটে-বাঁধা খেয়াতরী ভাসিয়া গিয়াছিল। তারপর বহু আঘাটা ঘুরিয়া অবশেষে তাহার জীর্ণ তরী এক যুগাবতার মহাপুরুষের আশ্রম-বন্দরে গিয়া ভিড়িয়াছিল।

আশ্রমে মহাপুরুষের সান্নিধ্যে থাকিয়া ব্রতীন শান্তি পাইয়াছিল, জীবনের একটি সুনির্দিষ্ট পন্থা দেখিতে পাইয়াছিল, মনুষ্যত্বের নিসংশয় মূল্য কোথায় তাহা অনুভব করিয়াছিল। ক্রমে আশ্রমের নিঃস্বার্থ ফললিপ্সাহীন কর্ম্মের মধ্যে সে ডুবিয়া গিয়াছিল।

এই আশ্রমেই তপতীর সহিত তাহার পরিচয় হয়। তপতীও ব্রতীনের মত নোঙর-ছেঁড়া নৌকা। দুজনের দুজনকে ভাল লাগিয়াছিল; আশ্রমের বহু যুবকযুবতীর মধ্যে ইহারা পরস্পরকে বিশেষভাবে কাছে টানিয়া লইয়াছিল। এই প্রীতির মধ্যে জৈব আকর্ষণ কতখানি ছিল বলা যায় না, তাহারা সজ্ঞানে কিছুই অনুভব করে নাই।

কিন্তু মহাপুরুষ তাহাদের মনের অবস্থা অনুভবে বুঝিয়াছিলেন। একদিন তাহাদের নিভৃতে ডাকিয়া স্মিতমুখে বলিলেন,—'তোমাদের মনের কথা আমি জানি। বিয়ে করবে?'

দুজনে গুরুর সম্মুখে পাশাপাশি বসিয়াছিল, তাঁহার কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল; পুলকিতচিত্তে ভাবিল, গুরু কি অন্তর্যামী? তাহাদের অন্তরের গূঢ়তম আকাঙ্ক্ষা তিনি জানিলেন কি করিয়া?

তাহাদের মুখের ভাব দেখিয়া গুরু আবার হাসিলেন, বলিলেন,—'বেশ, তোমাদের আমি বিয়ে দেব। কিন্তু একটি সর্ত্ত আছে। যতদিন ভারতবর্ষ স্বাধীন না হয় ততদিন ব্রহ্মচর্য পালন করবে।'

সর্ত্তের কথা শুনিয়া দুজনেই লজ্জা পাইয়াছিল; একটু কৌতুকও অনুভব করিয়াছিল। মাছকে যদি বলা হয়, তুমি সারা জীবন জলে বাস

করিবে তাহা হইলে সে কি দুঃখিত হয়? ব্রতীন ও তপতী এতাবৎ অনায়াসে অবহেলাভরে ব্রহ্মচর্য পালন করিয়াছে, কখনও গুরুতর চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটে নাই। তবে যে আজ তাহারা পরস্পরকে কামনা করিয়াছে, সে তো মনের প্রতি মনের আকর্ষণ; সান্নিধ্যের বাসনা, আত্মসমর্পণের আনন্দ। তাহারা পরস্পরের হইতে চায়, ইহার বেশী আর কিছু নয়।

নত মুখে ঘাড় নাড়িয়া তাহারা গুরুর সর্ত্ত সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। অতঃপর মহাপুরুষ স্বয়ং তাহাদের বিবাহ দিয়াছিলেন।

বিবাহের কিছুদিন পরে মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন,—'এখানকার কাজ তোমাদের শেষ হয়েছে। এখন গ্রামে গিয়ে বাস কর; তোমাদের আদর্শে গ্রামবাসীকে গ'ড়ে তোলো।'

ব্রতীনরা তিনপুরুষ আগে জমিদার ছিল। এখনও গ্রামে তাহাদের ভাঙা ভদ্রাসন ও কয়েক বিঘা জমি পড়িয়া ছিল। ব্রতীন তপতীকে লইয়া ভাঙ্গা ভদ্রাসনে গিয়া উঠিল।

তদবধি গত কয়েকমাস ধরিয়া এই গ্রামে তাহাদের জীবনযাত্রা শান্ত ধারায় বহিয়া চলিয়াছে। ব্রতীন জমিজমা দেখে, গ্রামের ছেলেবুড়োকে পড়ায়; তপতী গৃহকর্ম্ম করে, গ্রামের মেয়েদের শেলাই শেখায়, সুতা কাটিতে শেখায়। এমনিভাবে শীত বসন্ত কাটিয়াছে, জ্যৈষ্ঠও শেষ হইতে চলিল।

আজ সকালে ব্রতীন পাশের গ্রামে গিয়াছিল একজোড়া বলদ কিনিবার জন্য। বর্ষা নামিতে আর দেরী নাই, এখন হইতে চাষবাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। নিদাঘের কঠোর পৌরুষ কখন সংযম হারাইয়া সঞ্জীবনী ধারায় পৃথিবীকে নিষিক্ত করিবে তাহার স্থিরতা নাই, রৌদ্রঋতু-স্নাতা ধরিত্রী প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

পাশের গ্রামটি ক্রোশ দুই দূরে ; সেখানে দ্বিপ্রহর কাটাইয়া ব্রতীন বাড়ী ফিরিতেছিল। বলদ দুটি তাহার পছন্দ হইয়াছে, দরদামও ঠিক হইয়াছে—কাল সকালে তাহার লোক গিয়া তাহাদের লইয়া আসিবে।

ব্রতীন ভাবিতে ভাবিতে চলিযাছিল—বলদ দুটী তপতীর নিশ্চয় খুব পছন্দ হইবে। গোলগাল গড়ন, দুধের মত সাদা—যেন দুটি যমজ ভাই। ব্রতীন তাহাদের নাম রাখিবে কার্ত্তিক গণেশ—না—গৌর নিতাই। তপতী তাহাদের না দেখা পর্যন্ত উত্তেজনায় ছটফট করিয়া বেড়াইবে—রাত্রে ঘুমাইতে পারিবে না। তপতীর একটা অভ্যাস কোনও বিষয়ে অধিক কৌতূহল হইলে সে বাঁ হাত দিয়া ডান হাতের তর্জনী মুঠি করিয়া ধরিয়া দুই হাত একসঙ্গে নাড়িতে থাকে এবং অনর্গল প্রশ্ন করে। আজও তেমনি ভাবে দুই হাত নাড়িতে নাড়িতে জিজ্ঞাসা করিবে,—বলনা কেমন দেখতে ? কত বয়স ? শিং খুব বড় বড়—?

চিন্তাস্মিত মুখে চলিতে চলিতে ব্রতীন সহসা অনুভব করিল তাহার চারিদিকে আলোর উগ্রতা যেন ম্লান হইয়া গিযাছে। সে চকিতে চোখ তুলিয়া আকাশের পানে চাহিল ; তারপর থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার হর্ষোৎফুল্ল চোখে নীল কপিশ মেঘের ছায়া পড়িল। নৃত্য-পাগল বাউলের বিস্রস্ত জটা ছড়াইয়া পড়িয়াছে—সূর্য্যের চোখে গাঢ় মেঘের অঞ্জন। প্রবল বাতাসের ফুৎকারে ফুৎকারে মেঘের দল ছুটিয়া আসিতেছে —তাহাদের খাঁজে খাঁজে নীল বিদ্যুতের চাপা আগুন। বায়ুমণ্ডলে একটা শব্দহীন স্পন্দন উঠিতেছে—ঝনন্ ঝনন্—

ব্রতীন দাঁড়াইয়া প্রকৃতির এই হর্ষোন্মাদনা দেখিতে লাগিল। দূরে তাহার বাড়ীর পাশের তাল গাছটা নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, এখন

হঠাৎ যেন কোন অপ্রত্যাশিত আনন্দ-সংবাদ পাইয়া বাহু আস্ফালন করিয়া উন্মত্ত বেগে নাচিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে বিদ্যুৎ-কশাহত মেঘের দল আসিয়া পড়িল, মাঠের রৌদ্রদগ্ধ তৃণদল থরথর বেগে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ঝড়ের আবেগে সাড়া দিল। ব্রতীনের হাতে মুখে তপ্ত বাতাসের স্পর্শ লাগিল।

কিছুক্ষণ ঝড়ের মাতামাতি চলিবার পর বর্ষণ নামিল। বড় বড় ফোঁটা; প্রথমে অশ্রুজলের মত আতপ্ত, তারপর বরফের টুকরার মত ঠাণ্ডা। শীতলতা! কি অপূর্ব শীতলতা! চারিদিক বৃষ্টিধারায় ঝাপসা হইয়া গেল; দুর্ম্মদ বাতাস বৃষ্টিধারাকে মথিত করিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। সিক্ত-ভূমি হইতে ঝাঁঝালো সোঁদা গন্ধ উঠিল—

ব্রতীন যখন বাড়ী ফিরিল তখন তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া জলের স্রোত বহিতেছে। তপতী তাহাকে জানালা দিয়া দেখিয়াছিল, সে বারান্দায় উঠিতেই ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল, হাসিভরা অনুযোগের কণ্ঠে বলিল,—'বা রে, তুমি কেমন ভিজলে, আমি ভিজতে পেলুম না!'

ব্রতীন আঙুল দিয়া নিজের মুখের জল চাঁছিয়া লইয়া তপতীর মুখে তাহার ছিটা দিয়া বলিল,—'এই তো, ভেজো না।'

পাখীর কুহরণের মত ছোট একটি হাসি তপতীর কণ্ঠ হইতে বাহির হইল।

'ও বুঝি আবার ভেজা! বিষ্টিতে দাঁড়িয়ে না ভিজলে কি মজা হয়?'

ব্রতীন সিক্ত খদ্দরের পাঞ্জাবীটি খুলিয়া ফেলিতে ফেলিতে বলিল,—'বেশ তো তাই ভেজো। আমি তো ভেবেছিলুম এসে দেখব তুমি দিব্যি ভিজে বসে আছ।'

'ইচ্ছে কি হয়নি? কিন্তু ভয় হল তুমি এসে যদি বকো—! ভিজি

তাহলে ?' নিমেষ মধ্যে আঁচলটা গাছকোমর করিযা বাঁধিয়া সে তৈয়ার হইয়া দাঁড়াইল।

ব্রতীন স্নিগ্ধহাস্যে তাহার পানে তাকাইল। তাহার মনে হইল তপতী যেন হঠাৎ বদলাইয়া গিয়াছে, তাহার এ-রূপ তো সে আগে কখনও দেখে নাই। তপতীর দেহের যৌবন যেমন বস্ত্রের শাসন লঙ্ঘন করিয়া সহজে ধরা দেয় না, তাহার মনের ছেলেমানুষিও বাহিরের সংযত গাম্ভীর্য দিয়া ঢাকা থাকে, সহসা চোখে পড়ে না। কিন্তু আজ যেন বাহিরের সমস্ত আবরণ ফেলিয়া দিয়া তাহার ভিতরের চপলা তরুণীটি কলহাস্যে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ব্রতীন বিবাহের এতদিন পরে তাহার একটা নূতন পরিচয় পাইল।

ভিজা পাঞ্জাবীটা খুলিয়া মেঝেয় ফেলিতেই ব্রতীনের নগ্ন ঊর্ধ্বাঙ্গের উপর তপতীর দৃষ্টি পড়িল। বিস্তৃত বক্ষ, বলিষ্ঠ দুই বাহু ; বুকের মাঝখান দিয়া বিরল রোমশতার একটি রেখা নামিয়াছে। তপতী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া ক্ষণেক চাহিয়া রহিল। ব্রতীনকে নগ্নদেহে সে ইতিপূর্বে দেখে নাই।

এই সময় শীকরসিক্ত বাতাসের একটা ঝাপটা আসিয়া তপতীর গায়ে লাগিল ; তাহার বুকে গলায় রোমাঞ্চ সঞ্চার করিয়া সারা দেহে শিহরণ জাগাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। এই অনাহূত হর্ষের লজ্জা চাপিবার জন্যই যেন সে ব্রতীনের হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল,—'চল, তোমাকেও ছাড়্‌ব না—দু'জনে মিলে ভিজব—'

দুজনে উঠানে গিয়া ভিজিল। তারপর মাঠে গিয়া বৃষ্টির মধ্যে ছুটা-ছুটি করিল। তপতী একবার পা পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়া কাদায় মাখা-মাখি হইল ; ঝড়ের গর্জনের সঙ্গে তাহাদের মিলিত হাস্যরব মিশিল।

সন্ধ্যার নিস্তেজ আলোতে ঘন ধারাবর্ষণের কুজ্ঝটিকার মধ্যে তাহাদের এই উচ্ছ্বসিত ঋতু-সম্বর্ধনা কেহ লক্ষ্য করিল না।

অবশেষে ভিজিবার সাধ আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া তাহারা বাড়ী ফিরিয়া আসিল। বারান্দায় দুজনে হাসিমুখে দুজনের দিকে ফিরিল।

'কেমন, মন ভরেছে এবার—?' সকৌতুকে পরিহাস করিতে গিয়া ব্রতীনের গলার কথাটা আট্‌কাইয়া গেল, যেন কে তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়াছে। বৃষ্টির মধ্যে হুড়াহুড়ি করিবার সময় সে এমন করিয়া তপতীর সিক্তবাস-দেহটী লক্ষ্য করে নাই,—এ যেন ভবা-পুকুরে প্রায়-ডুবিয়া-যাওয়া একটি কুমুদ ফুল ফুটিযাছে ; নারীত্বের গৌরবে তাহার যৌবন-শ্রী যেন উদ্ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ব্রতীন ক্ষণেক নিশ্বাস রোধ করিয়া রহিল, তারপর চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া বলিল,—'যাও, আর দেরী কোরো না, ভিজে কাপড় ছেড়ে ফেল।' বলিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিল।

রাত্রি হইয়াছে। বায়ুর বেগ ও মেঘের গর্জন অনেকটা শান্ত হইয়াছে বটে কিন্তু বৃষ্টিধারা তেমনি অবিশ্রাম ঝরিয়া চলিয়াছে। মাঝে মাঝে অল্প বিদ্যুৎ চমকিতেছে—যেন পরিতৃপ্ত মুখের হাসি।

তপতীর শয়নঘরে খোলা জানালার সম্মুখে ব্রতীন ও তপতী পাশাপাশি দাঁড়াইয়া ছিল। ঘরের কোণে রেড়ির তেলের প্রদীপ—ঘরটি ছায়াময় স্বপ্নকুহকপূর্ণ। একপাশে তপতীর সঙ্কীর্ণ শুভ্র শয্যা অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

জানালার বাহিরে বৃষ্টির রোমাঞ্চবিদ্ধ অন্ধকার। মাথার উপর তাল-গাছটা গদ্‌গদকণ্ঠে অর্থহীন কথা বলিতেছে। কিন্তু যথার্থই কি অর্থহীন কথা? কান পাতিয়া শুনিলে যেন তাহার অর্থ বোঝা যায়—আদর-

সোহাগ-প্রীতি মিশ্রিত রতিস্নিগ্ধসার্দ্র কলকূজন। ব্রতীন অনুভব করিল, মাটির তলায় অসংখ্য শুষ্ক বীজ সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে—অঙ্কুরিত হইতেছে, তাহাদের কণ্ঠেও এই রসার্দ্র শীৎকার, গাঢ় গদ্গদভাষণ। ধরিত্রীর দেহ হইতে একটি সুমিষ্ট গন্ধ বাহির হইয়া আসিতেছে, যেন সম্ভুক্তা বধূর নিবিড় দেহ-সৌরভ।

তপতী শান্ত ভাবেই ব্রতীনের পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু তাহার মনের ভিতরটা কেমন যেন অশান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে পাশের দিকে তাকাইল, আবছায়া-আলোতে ব্রতীনের মুখ ভাল দেখা গেল না। নিরুৎ-সুক কণ্ঠে তপতী জিজ্ঞাসা করিল,—'বলদ কেমন দেখলে?'

'ভাল।' ব্রতীন তপতীর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল, একটু করুণ হাসিয়া বলিল,—'আজ কি খেতে ইচ্ছে করছে জানো? মসুর ডালের খিচুড়ি আর ডিম ভাজা।'

'আমারও!' প্রবল উচ্ছ্বাসের সহিত কথাটা তপতীর মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল। তার পর দু'জনেই একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল। কিন্তু হাসির পিছনে অনেকখানি ব্যর্থতা ছিল। দু'জনেই জানে মসুর ডাল এবং ডিম নিষিদ্ধ খাদ্য—গুরুর নিষেধ।

তপতীর চোখ ছলছল করিয়া উঠিল—সে ব্রতীনের একটু কাছে সরিয়া আসিয়া তাহার হাতের উপর হাত রাখিল। ব্রতীন চমকিয়া উঠিল। তপতীর হাতের স্পর্শ তপ্ত—তাহার যেন জ্বর হইয়াছে।

ব্রতীন ধীরে ধীরে নিজের হাত সরাইয়া লইল, তারপর জানালার দিকে ফিরিয়া বাহিরের মসীলিপ্ত দুরবগাহ রহস্যের পানে চক্ষু মেলিয়া রহিল।

আজ বর্ষাগমের সঙ্গে সঙ্গে ব্রতীনের রক্তে ছন্দের একটা দোলা লাগিয়াছিল। এই ছন্দ মৃদঙ্গের মত তাহার মাথার মধ্যে বাজিতে আরম্ভ

করিয়াছিল। ·.স্থর লয়ে আরম্ভ হইয়া ক্রমে তাহার গতি দ্রুত হইতে দ্রুততর হইয়া এখন এমন এক স্থানে পৌছিযাছিল যেখানে সব সঙ্গীত পরিণতির চরম সমে গিয়া পরিসমাপ্তি লাভ করে ; অন্তঃপ্রকৃতির হর্ষাবেগ বহিঃপ্রকৃতির সহিত ওতপ্রোত একাকার হইয়া যায়। ব্রতীনের স্নায়ুশিরাব এই পরমোৎকণ্ঠা দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছিল।

ঘরের কোণে প্রদীপের সোনালী শিখাটি অল্প অল্প নড়িতেছে, যেন একটি স্নিগ্ধ অথচ সতর্ক চক্ষু ব্রতীন ও তপতীর উপর দৃষ্টি রাখিয়াছে। ব্রতীনের নাভি হইতে একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, সে তপতীর দিকে ফিরিল। তপতীর একটা হাত জানালার উপর রাখা ছিল, ব্রতীন তাহার উপর হাত রাখিয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিল,—'তপতী।'

এবার তপতী হাত টানিয়া লইল। উচ্চকিত জিজ্ঞাসায় ব্রতীনের মুখের পানে চোখ তুলিয়া তপতীর সারা দেহ যেন ঝাঁকানি দিয়া কাঁপিয়া উঠিল; ব্রতীনের মুখের দর্পনে তপতীর মনের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। তপতীর বুকের ভিতরটা অসহ্য স্পন্দনে ধড়ফড় করিতে লাগিল, সে দু'হাতে বুক চাপিয়া ধরিল।

ব্রতীন আরও কাছে সরিয়া আসিয়া আবার ডাকিল,—'তপতী।'

ব্যাকুল চক্ষে চাহিয়া তপতী বলিয়া উঠিল,—'একটা কথা তোমায় বলা হয়নি। আজ গুরুদেবের চিঠি এসেছে।'

পাথরের মূর্তির মত ব্রতীন দাঁড়াইয়া রহিল। কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল সে নিজেই জানে না। তারপর মনের অতল হইতে উঠিয়া আসিয়া সে দেখিল জানালার উপর মুখ রাখিয়া তপতী নিঃশব্দে স্থির হইয়া আছে।

নীরস কণ্ঠে ব্রতীন বলিল, 'আজ রাত্রে কিছু খাব না—ক্ষিদে নেই।' বলিয়া নিজের শয়ন ঘরে গিয়া মাঝের দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

মধ্য রাত্রি। বর্ষনের ধারা এখনও থামে নাই—কিন্তু তাহার স্বর বদলাইয়া গিয়াছে। ক্লান্ত দেহে বিস্রস্ত কুন্তলে সে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছে, মাটিতে মাথা কুটিতেছে—

পাশাপাশি দুই অন্ধকার ঘরে দুইটি স্ত্রী-পুরুষ উর্ধ্বমুখ হইয়া শুইয়া আছে—তাহাদের অপলক চক্ষু অন্ধকারের রহস্য ভেদ করিতে পারিতেছে না। তাহাদের জীবনে ইহা পরম সিদ্ধি অথবা চরম ব্যর্থতা—তাহা কে বলিবে ?

তক্ত্ মোবারক

১

মুরশিদাবাদের প্রাচীন রাজপ্রাসাদের অনাবৃত চত্বরে বহুদিন ধরিয়া একখানি রাজসিংহাসন পড়িয়া থাকিত। ইহার নাম তক্ত্ মোবারক—মঙ্গলময় সিংহাসন। অতি সাধারণ প্রস্তরে নির্মিত অনতিবৃহৎ সিংহাসন, বোধকরি দেড় শত বৎসর এমনি অনাদরে অবহেলায় পড়িয়াছিল। যে বণিক-সম্প্রদায়ের তুলাদণ্ড সহসা একদিন রাজদণ্ডে পরিণত হইয়াছিল, তাঁহারা সুড়ঙ্গপথের অন্ধকারে আপন সিংহাসন লইয়া আসিয়াছিলেন, এই পুরাতন সিংহাসন ব্যবহার করেন নাই। তক্ত্ মোবারকে শেষ উপবেশন করিয়াছিলেন প্রভুদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর।

পরবর্তী কালে লর্ড কর্জন প্রত্নরক্ষায় তৎপর হইয়া এই সিংহাসন কলিকাতায় আনয়ন করেন, পরে উহা ভিক্টোরিয়াল মেমোরিয়লে রক্ষিত হয়।

তক্ত্ মোবারক—মঙ্গলময় সিংহাসন! কথিত আছে, এখনও গ্রীষ্মকালে এই সিংহাসনের পাষাণগাত্র বহিয়া রক্তবর্ণ স্বেদ ঝরিতে থাকে, যেন বিন্দু বিন্দু রক্ত ক্ষরিত হইতেছে। সেকালে মুরশিদাবাদের মুসলমানদের মধ্যে বিশ্বাস ছিল, বাদশাহীর অতীত গৌরবগরিমা স্মরণ করিয়া তক্ত্ মোবারক শোণিতাশ্রু বিসর্জন করে। কিন্তু তাহা ভ্রান্ত বিশ্বাস। তক্ত্ মোবারকের শোণিত-ক্ষরণের ইতিকথা আরও নিগূঢ়, আরও মর্মান্তিক।

তক্ত্ মোবারকের মত এমন অভিশপ্ত সিংহাসন বোধকরি পৃথিবীতে আর নাই। সুবা বিহারের অন্তর্ভুক্ত মুঙ্গের সহরে এই সিংহাসন নির্মিত হইয়াছিল, সম্রাট সাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সুজা আদেশ দিয়া উহা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। জন্মক্ষণ হইতেই অভিশাপের কালকূট যে এই সিংহাসনের প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ডটি নিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছে সুজা তাহা জানিতেন না, বোধহয় শেষ পর্যন্ত বুঝিতে পারেন নাই; এই বিশেষত্বহীন স্থূল কারুকার্য-খচিত সিংহাসনটির প্রতি তাঁহার অহেতুক মোহ জন্মিয়াছিল।

তখন সাজাহানের রাজত্বশেষে ভ্রাতৃযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। ঔরংজেবের নিকট পরাভূত হইয়া সুলতান সুজা পলায়নের পথে কিছুকাল মুঙ্গেরে অবস্থান করিয়াছিলেন; তারপর ঔরংজেবের সেনাপতি মীরজুমলার তাড়া খাইয়া সেখান হইতে রাজমহলে পলায়ন করেন। তক্ত্ মোবারক তাঁহার সঙ্গে ছিল। কিন্তু রাজমহলেও বেশী দিন থাকা চলিল না, তিনি সিংহাসন লইয়া ঢাকায় গেলেন।

মীরজুমলা যখন তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ঢাকায় উপস্থিত হইলেন তখন সুজার শোচনীয় অবস্থা; তিনি তক্ত্ মোবারক ঢাকায় ফেলিয়া আরাকানে পলায়ন করিলেন। অতঃপর যে রক্ত-কলুষিত স্বখাত-সলিলে তাঁহার সমাধি হইল তাহার বহু কিম্বদন্তী আছে, কিন্তু জীবিতলোকে আর তাঁহাকে দেখা যায় নাই। শাহেনশা বাদশার পুত্র এবং ময়ূর সিংহাসনের উমেদার সুজার ইতিবৃত্ত এইখানেই শেষ। অভিশাপ কিন্তু এখনই শেষ হইল না।

পরিত্যক্ত সিংহাসন মীরজুমলার কবলে আসিল। মীরজুমলা অন্তরে অন্তরে দুরন্ত উচ্চাভিলাষী ছিলেন; সুবা বাংলার সিংহাসনের উপর

তাঁহার লোভ ছিল। তক্ত্ মোবারক হাতে পাইয়া তাঁহার লোভ আরও বাড়িল। কিন্তু ঔরংজেবকে তিনি যমের মত ভয় করিতেন। একদিন গোপনে তিনি নিজ শিবিরে তক্ত্ মোবারকের উপর মসলন্দ পাতিয়া বসিলেন এবং আলবোলায় অম্বুরী তামাকু সেবন করিতে করিতে প্রভু-দ্রোহিতার স্বপ্ন দেখিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল।

অতঃপর তক্ত্ মোবারক কি করিয়া ঢাকা হইতে আবার পশ্চিম বঙ্গে ফিরিয়া আসিল তাহার কোন ইতিহাস নাই। নবাবী আমলে মুরশিদকুলি খাঁ'র জামাতা সুজা খাঁ এই সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। শীঘ্রই তাঁহার মৃত্যু হইল।

তাঁহার পুত্র সরফরাজ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। সরফরাজকেও বেশী দিন রাজ্য ভোগ করিতে হয় নাই। গিরিয়ার প্রান্তরে বিদ্রোহী ভৃত্য আলিবর্দির সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হইলেন। আলিবর্দি শূন্য সিংহাসন দখল করিলেন।

আলিবর্দির পালা শেষ হইলে আসিলেন সিরাজদ্দৌলা। তাঁহার পর মীরজাফরও এই সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। তারপর যবনিকা পড়িল।

তক্ত্ মোবারকের রক্তক্ষরণ শোকাশ্রু নয়! ইহার মূল উৎস অন্বেষণ করিতে হইলে তক্ত্ মোবারকের রচয়িতা মুঙ্গের নিবাসী খ্‌াজা নজর বোখারী নামক জনৈক প্রস্তর-শিল্পীর জীবন কাহিনী অনুসন্ধান করিতে হয়। কে ছিল এই খ্‌াজা নজর বোখারী?

তক্ত্ মোবারকের গাত্রে পারস্য ভাষায় নিম্নোক্ত কথাগুলি খোদিত আছে—"এই পরম মঙ্গলময় তক্ত্ মোবারক সুবা বিহারের মুঙ্গের সহরে

১০৫২ সালের ২৭ শাবান তারিখে দাসানুদাস খ্‌াজা নজর বোখারী কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল।"

এই পরম মঙ্গলাস্পদ তক্ত্ মোবারকের প্রত্যেকটি প্রস্তরখণ্ডে শিল্পী খ্‌াজা নজর বোখারী তাহার পিতৃহৃদয়ের জ্বলন্ত রক্তাক্ত অভিশাপ ঢালিয়া দিয়াছিল। যতদিন সিংহাসনেব অস্তিত্ব থাকিবে ততদিন এই অভিশাপের বিষক্রিয়া শান্ত হইবে না। শুধু সুলতান সুজার বিরুদ্ধেই নয়, এ অভিশাপ গর্বান্ধ উচ্ছৃঙ্খল রাজশক্তির বিরুদ্ধে, মানুষের মনুষ্যত্বকে যাহারা শক্তির দর্পে অপমান করে তাহাদের বিরুদ্ধে। তাই বোধহয় ইহার ক্রিয়া এখনও শেষ হয় নাই।

২

মুঙ্গেরের উত্তরবাহিনী গঙ্গা প্রাচীন কেল্লার কোল দিয়া বহিয়া গিয়াছে। আজ হইতে তিন শত বছর আগেকার কথা; কিন্তু তখনই মুঙ্গেরের কেল্লা পুরাতন বলিয়া পরিগণিত হইত। তাহারও শতাধিক বর্ষ পূর্বে লোদি বংশের এক নরপতি বিহার পুনরধিকার করিতে আসিয়া মুঙ্গেরে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তখনও এই কেল্লা দণ্ডায়মান ছিল। কোন্ স্মরণাতীত যুগে কাহার দ্বারা এই দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল কেহ জানে না। হিন্দুরা বলিত, জরাসন্ধের দুর্গ।

মুঘল বাদশাহীর আমলে মুঙ্গের শহরের বিশেষ প্রাধান্য ছিল না; ইতিহাসের পাকা সড়ক হইতে শহরটি দূরে পড়িয়া গিয়াছিল। যে সময়ের কথা, সে সময় একজন মুঘল ফৌজদার কিছু সৈন্য সিপাহী লইয়া এই দুর্গে বাস করিতেন বটে কিন্তু দীর্ঘ শান্তির যুগে দুর্গটিকে যত্নে রাখিবার কোনও

সামরিক প্রয়োজন কেহ অনুভব করে নাই; প্রাকারের পাথর খসিয়া খসিয়া পড়িতেছিল, চারিদিকের পরিখা প্রায় ভরাট হইয়া গিয়াছিল।

দুর্গের পূর্ব দক্ষিণ ও উত্তরে তিনটি দ্বার; তিনটি সেতু পরিখার উপর দিয়া বহির্ভূমির সহিত দুর্গের সংযোগ রক্ষা করিয়াছে। পরিখা পরপারের দুর্গকে বেষ্টন করিয়া অর্ধচন্দ্রাকার শহর। শহরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানের বাস। হিন্দুরা প্রাতঃকালে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিত, তারপর ঘৃত, তিসি ও তেজারতির ব্যবসা করিত; মুসলমানেরা প্রতি শুক্রবারে দুর্গমধ্যস্থ 'পীর শাণফা' নামক পীরের দরগায় শিন্নি চড়াইত। তাহাদের জীবনযাত্রায় অধিক বৈচিত্র্য ছিল না।

একদিন ফাল্গুন মাসের মধ্যাহ্নে কেল্লার দক্ষিণ দরজার বাহিরে, পরিখার অগভীর খাত যেখানে গঙ্গার স্রোতের সহিত মিলিয়াছে সেইখানে বসিয়া একটি যুবক মাছ ধরিতেছিল। অনেকগুলি নামগোত্রহীন গাছ হলুদবর্ণ ফুলের ঝালর ঝুলাইয়া স্থানটিকে আলো করিয়া রাখিয়াছে; সম্মুখে বিপুলবিস্তার গঙ্গার বুকে দুই একটি চর জাগিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সময় প্রায় প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে পশ্চিম হইতে বাতাস ওঠে, চরের বালু উড়িয়া আকাশ কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন হইয়া যায়। গৃহবাসী মানুষ ঝরোখা বন্ধ করিয়া ঘরের অন্ধকারে আশ্রয় লয়, কেবল বহিঃপ্রকৃতির কবোষ্ণ শূন্যতায় বসন্তের বিদায়-বার্তাবহ পাখী গাছের বিরল পত্রান্তরাল হইতে ক্লান্ত-স্তিমিত কণ্ঠে ডাকিয়া ওঠে—পিউ বহুৎ দূর! আজও পাখী থাকিয়া থাকিয়া ডাকিতেছিল—পিউ বহুৎ দূর।

হলুদবর্ণ ফুলের ভারে অবনম্র একটি নামহীন গাছ গঙ্গার স্রোতের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া যেন দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল। চারিদিক নির্জন, আকাশে বালু উড়িতেছে, পিছনে

ভীমকান্তি দুর্গের উত্তুঙ্গ প্রাকার বহু ঊর্ধ্বে মাথা তুলিয়াছে—এইরূপ পরিবেশের মধ্যে ঐ পীত-পুষ্পিত গাছের ছায়ায় বসিয়া যুবকটি নিবিষ্টমনে ছিপ দিয়া মাছ ধরিতেছিল।

যুবকের নাম মোবারক। সে কান্তিমান পুরুষ, বলিষ্ঠ চেহারায় একটি উচ্চ আভিজাত্যের ছাপ আছে। তাহার বয়স বড় জোর কুড়ি একুশ, গায়ের বর্ণ পাকা খরমুজার মত; ঈষৎ গোঁফের রেখা ও চিবুকের উপর কুঞ্চিত শ্মশ্রুর আভাস তাহার মুখে একটি তীক্ষ্ণ মাধুর্য আনিয়া দিয়াছিল। তাহার উপর চোখে শুর্মা, পরিধানে ঢিলা পায়জামা ও ঢিলা আস্তিনের ফেন-শুভ্র মল্‌মলী কুর্তা। মেয়েদের তো কথাই নাই, পুরুষেরাও মোবারককে একবার দেখিলে ঘাড় ফিরাইয়া আবার তাকাইত।

মোবারক মাছ ধরিতে ভালবাসে, মাছ ধরা তাহার নেশা; তবু আজ যে এই বালু-বিকীর্ণ মধ্যাহ্নে সে ঘরের আকর্ষণ উপেক্ষা করিয়া মাছ ধরিতে আসিয়াছে তাহার অন্য কারণও ছিল। পরীবানুর সহিত তাহার বাজি লাগিয়াছিল। পরীবানু মোবারকের বধূ, নববধূও বলা চলে, কারণ বিবাহ যদিও কয়েক বছর আগে হইয়াছে, মিলন হইয়াছে সম্প্রতি। পরীর বয়স সতেরো বছর, রূপে সে মোবারকের যোগ্যা বধূ—অনিন্দ্য-সুন্দরী; বাদশাহের হারেমেও এমন সুন্দরী দেখা যায় না। মাত্র ছয় মাস তাহারা একত্র ঘর করিতেছে; নব অনুরাগের মদবিহ্বলতায় দুজনেই ডুবিয়া আছে।

পরী তামাসা করিয়া বলিয়াছিল,—"ভারি তো রোজ রোজ তালাওয়ে মাছ ধরো। দরিয়ায় মাছ ধরতে পারো তবে বুঝি বাহাদুরী।"

মোবারক বলিয়াছিল,—"কেন, দরিয়ায় মাছ ধরা এমন কি শক্ত কাজ?"

"শক্ত নয়? ধরেছ কোনও দিন?"

"যখন ইচ্ছে ধরতে পারি।"

"ধরো না দেখি। পুকুরের পোষা মাছ সবাই ধরতে পারে। গঙ্গার মাছ ধরা অত সোজা নয়।"

"বেশ, রাখো বাজি।"

"রাখো বাজি।"

মোবারক ওড়না ধরিয়া পরীকে কাছে টানিয়া লইয়াছিল; কানে কানে বাজির সর্ত স্থির হইয়াছিল। সর্ত বড় মধুর। অতঃপর মোবারক ছিপ এবং আনুষঙ্গিক উপকরণ লইয়া মহোৎসাহে দরিয়ায় মাছ ধরিতে বাহির হইয়াছিল।

মাছ কিন্তু ধরা দেয় নাই, একটি পুঁটিমাছও না। যবের ছাতু, পিঁপড়ার ডিম, পণির প্রভৃতি মুখরোচক টোপ দিয়াও গঙ্গার মাছকে প্রলুব্ধ করা যায় নাই। দীর্ঘকাল ছিপ হাতে বসিয়া থাকিয়া মোবারক বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সূর্য্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছে, গাছের ছায়া গাছের তলা হইতে সরিয়া যাইতেছে। অন্য দিন হইলে মোবারক বাড়ী ফিরিয়া যাইত, কিন্তু আজ এত শীঘ্র শূন্য হাতে বাড়ী ফিরিলে পরী হাসিবে। সে বড় লজ্জা। মোবারক বঁড়্শির টোপ বদলাইয়া বঁড়্শি জলে ফেলিল এবং দৃঢ় মনোযোগের সহিত ফাৎনার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

গাছের উপর হইতে একটা পাখী বিরস স্বরে বলিল,—'পিউ বহুৎ দূর!'

মোবারকের অধর কোণে চকিত হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে উপর দিকে চোখ তুলিয়া মনে মনে বলিল,—"সাবাস পাখী! তুই জান্‌লি কি ক'রে?"

এই সময় গঙ্গার দিক হইতে দূরাগত তূর্য ও নাকাড়ার আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেই মোবারক চমকিয়া সেই দিকে চাহিল। গঙ্গার কুঞ্চিত জলের উপর সূর্যের আলো ঝল্‌মল্‌ করিতেছে। দূরে দক্ষিণদিকে অসংখ্য নৌকার পাল দেখা দিয়াছে, বোধ হয় দুই শত রণতরী। ঐ তরণীপুঞ্জের ভিতর হইতে গভীর রণবাদ্য নিঃস্বনিত হইতেছে।

স্রোতের মুখে অনুকূল পবনে তরণীগুলি রাজহংসের মত ভাসিয়া আসিতেছে। মোবারক লক্ষ্য করিল, তরণীব্যূহের মাঝখানে চক্রবাকের মত স্বর্ণবর্ণ একটি পাল রহিয়াছে। সেকালে সম্রাট ভিন্ন আর কেহ রক্ত-বর্ণ শিবির কিম্বা নৌকার পাল ব্যবহার করিবার অধিকারী ছিলেন না; কিন্তু সম্রাট-পদ-লিপ্সুরা নিজ নিজ গৌরব গরিমা বাড়াইবার জন্য পূর্বাহ্নেই এই রাজকীয় প্রতীক ধারণ করিতেন। মোবারকের বুঝিতে বিলম্ব হইল না, কে আসিতেছে। সে অস্ফুট স্বরে বলিল,—"ঐ রে সুলতান সুজা ফিরে এল।"

কয়েক মাস পূর্বে সম্রাট সাজাহানের মৃত্যুর জনরব শুনিয়া সুলতান সুজা এই মুঙ্গের শহর হইতেই মহা ধূমধামের সহিত পাল উড়াইয়া আগ্রা যাত্রা করিয়াছিলেন। যে ঘাটে নৌবহর সাজাইয়া তিনি যাত্রা করিয়া-ছিলেন তাহার নাম দিয়াছিলেন সুজাই ঘাট *। এখন খাজুয়ার যুদ্ধে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঔরংজেবের হাতে পরাজিত হইয়া তিনি আবার সুজাই ঘাটে ফিরিয়া আসিতেছেন।

মোবারক অবশ্য যুদ্ধে পরাজয়ের খবর জানিত না। কিন্তু মুঙ্গেরের মত ক্ষুদ্র শহরে সাম্রাজ্যগৃধ্নু যুবরাজ ও বিপুল সৈন্যবাহিনীর শুভাগমন

---

* অদ্যাপি এই ঘাট 'সুজি ঘাট' নামে পরিচিত।

হইলে সাধারণ নাগরিকের মনে সুখ থাকে না। সৈন্যদল যতই শান্ত সুবোধ হোক, অসামরিক জনমণ্ডলীর নিগ্রহ ঘটিয়া থাকে। গতবারে ঘটিয়াছিল, এবারও নিশ্চয় ঘটিবে। তাই মোবারক মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

দুর্গমধ্যেও নৌবহরের আগমন লক্ষিত হইয়াছিল। ফৌজদার মহাশয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি শান্তিপ্রিয় প্রৌঢ় ব্যক্তি; সাজাহানের নিরুপদ্রব দীর্ঘ রাজত্বকালে নিশ্চিন্তে ফৌজদারী ভোগ করিয়া তিনি কিছু অলস ও অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজ-দরবারের সমস্ত খবরও তাঁহার কাছে পৌঁছিত না; ভায়ে ভায়ে সিংহাসন লইয়া লড়াই বাধিয়াছে এইটুকুই তিনি জানিতেন। কয়েক মাস পূর্বে সুজা আগ্রার পথে যাত্রা করিলে তিনি বেশ উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন; হয়তো আশা করিয়াছিলেন তক্ত্ তাউস্ সুজারই কবলে আসিবে। তাই তাঁহাকে আবার ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া তিনি বিব্রত হইয়া পড়িলেন। যাহোক, সুলতান সুজাকে অমান্য করা চলে না, সিংহাসন পান বা না পান তিনি শাহাজাদা। উপরন্তু তাঁহার সঙ্গে অনেক সৈন্য সিপাহী রহিয়াছে।

দুর্গের দক্ষিণ দ্বার হইতে সুজাই ঘাট মাত্র দুইশত গজ দূরে। ফৌজদার মহাশয় কয়েকজন ঘোড়সওয়ার লইয়া ঘাটে সুজার অভ্যর্থনা করিতে গেলেন।

দেখিতে দেখিতে নৌবহর আসিয়া পড়িল। মোবারক যেখানে মাছ ধরিতে বসিয়াছিল সেখান হইতে বাঁদিকে ঘাড় ফিরাইলেই সুজাই ঘাট দেখা যায়। ঘাটটি আয়তনে ছোট; সব নৌকা ঘাটে ভিড়িতে পারিল না, ঘাটের দুইপাশে কিনারায় নঙ্গর ফেলিতে লাগিল। চারিদিকে চেঁচা-মেচি হুড়াহুড়ি, মাঝিমাল্লার গালাগালি; গঙ্গার তীর দুর্গের কোল পর্য্যন্ত

তোলপাড় হইয়া উঠিল। মোবারক দেখিল এখানে মাছ ধরার চেষ্টা বৃথা! সে ছিপ গুটাইয়া বাড়ী ফিরিয়া চলিল। বিরক্তির মধ্যেও তাহার মনে এইটুকু সান্ত্বনা জাগিতে লাগিল, পরীবানুর কাছে কৈফিয়ৎ দিবার মত একটা ছুতা পাওয়া গিয়াছে।

৩

কেল্লার পূর্ব্বদ্বার হইতে যে রাজপথ আরম্ভ হইয়াছে তাহা শহরকে দুই সমানভাগে বিভক্ত করিয়া বাংলার রাজধানী রাজমহলের দিকে গিয়াছে। এই পথের দুই পার্শ্ব, দুর্গমুখ হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পর্যন্ত গিয়া, ক্রমে গৃহবিরল হইতে হইতে অবশেষে নিরবচ্ছিন্ন মাঠ-ময়দানে পরিণত হইয়াছে। এইখানে নগর-সীমান্তে একটি ক্ষুদ্র চটি আছে—চটির নাম পূরব সরাই। পূর্ব হইতে সমাগত যাত্রীদল এই চটিতে রাত্রির মত আশ্রয় পায়, পরদিন শহরে প্রবেশ করে।

চটি হইতে কিছুদূরে একটি ক্ষুদ্র পাকাবাড়ী, ইহা মোবারকের পিতৃ-ভবন। কাছাকাছি অন্য কোনও গৃহ নাই, বাড়ীটি রাজপথের ধারে নিঃসঙ্গ দাঁড়াইয়া আছে; আকারে ক্ষুদ্র হইলেও তাহার যেন একটু আভিজাত্যের অভিমান আছে। পূরব সরাই চটি ও তাহার আশেপাশে যে দু'চারিটি দীনমূর্ত্তি গৃহ দেখা যায় সেগুলি, যেন ঐ বাড়ীখানি হইতে সসম্ভ্রমে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

চূণকাম-করা সুশ্রী বাড়ী; সম্মুখের বারান্দা জাফ্‌রিকাটা পাথরের অনুচ্চ আলিসা দিয়া ঘেরা। বাড়ী এবং পথের মধ্যস্থলে খানিকটা মুক্ত অঙ্গন, সেখানে নানা আকৃতির ছোটবড় পাথরের পাটা পড়িয়া আছে—পাশে একটি খাপরা-ছাওয়া ক্ষুদ্র চালা। চালার ভিতরেও নানা আকৃতির

পাথর রহিয়াছে, কিন্তু সেগুলি বাটালির ঘায়ে পরিগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহা হইতে অনুমান হয়, গৃহস্বামী একজন প্রস্তর-শিল্পী।

প্রস্তর-শিল্পী গৃহস্বামীব নাম খ্‌াজা নজর বোখারী। ইনিই মোবারকের পিতা। বয়স পঁয়তাল্লিশ পার হয় নাই, দেহ এখনও দৃঢ় ও কর্মপটু ; কিন্তু এই বয়সেই ইঁহার মুখমণ্ডল হইতে যৌবনের উন্মাদনা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। সুন্দর পৌরুষ-বলিষ্ঠ অবয়বে জরার চিহ্নমাত্র নাই, তবু মনে হয তিনি বৃদ্ধত্বের নিষ্কাম তৃপ্তিলোকের সন্ধান পাইয়াছেন। মুখে একটি শান্ত দীপ্তি। যাহারা স্থূল ইন্দ্রিয়সুখ ও ভোগলিপ্সা কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছে তাহাদের মুখেই এমন সৌম্য জ্যোতি দেখিতে পাওয়া যায়।

খ্‌াজা নজর বোখারী ধনী ব্যক্তি নহেন, প্রস্তর-শিল্প তাঁহার জীবিকা। যাহারা নূতন গৃহ নির্মাণ করায তাহারা তাঁহাকে দিয়া পাথবের স্তম্ভ খিলান জাফ্‌রি প্রভৃতি তৈয়ার করাইয়া লয়। তবু শহরের ইতর ভদ্র সকলেই তাঁহার চরিত্রগুণে এবং পূর্ব-ইতিহাস স্মরণ করিয়া তাঁহাকে সম্ভ্রম করিয়া চলে। সাধারণের নিকট তিনি মিঞা সাহেব নামে পরিচিত।

এইখানে খ্‌াজা নজরের পূর্বকথা সংক্ষেপে ব্যক্ত করা প্রয়োজন।

খ্‌াজা নজরের পিতা বোখারা হইতে হিন্দুস্থানে আসিয়াছিলেন। সে-সময় দিল্লীর দরবারে গুণের আদর ছিল, দেশদেশান্তর হইতে জ্ঞানী গুণী আসিয়া বাদশাহের অনুগ্রহ লাভ করিতেন। বোখারা একে পর্বত-বন্ধুর দরিদ্র দেশ, উপরন্তু তখন পারস্যের অধীন। সেখানে ভাগ্যোন্নতির আশা নাই দেখিয়া খ্‌াজা নজরের পিতা বালকপুত্র সমভিব্যহারে দিল্লী উপনীত হইলেন।

তিনি পরম সুপুরুষ ছিলেন, উত্তম যোদ্ধা বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি

ছিল। শীঘ্রই তিনি সাজাহানের নজরে পড়িলেন। তারপর একদিন মুঙ্গেরের ফৌজদার পদের সনদ পাইয়া বিহার-প্রান্তের এই প্রাচীন দুর্গে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন। ইহা সাজাহানের রাজত্বকালের গোড়ার দিকের কথা।

তারপর দশ বৎসর নিরুপদ্রবে কাটিয়া গেল। বিশাল সাম্রাজ্যের এ-প্রান্তে যুদ্ধ-বিগ্রহের হাঙ্গামা নাই তাই ফৌজদার নিজের শৌর্যবীর্য দেখাইয়া আরও অধিক পদোন্নতির সুযোগ পাইলেন না, তিনি ফৌজদারই রহিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে এক সৈয়দবংশীয়া কন্যার সহিত খ্‌ৱাজা নজরের বিবাহ হইল।

খ্‌ৱাজা নজর তখন ভাবপ্রবণ কল্পনাবিলাসী যুবক। তিনি পারশিক ভাষায় শয়ের লিখিতেন ; ভাস্কর্য এবং স্থপতি-শিল্পের উপরও তাঁহার গাঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছিল। পিতৃসৌভাগ্যের ছায়াতলে বসিয়া তিনি পরম নিশ্চিন্ত মনে শিল্পকলার চর্চা করিতে লাগিলেন। যোদ্ধার তরবারির পরিবর্তে ভাস্করের ছেনি ও বাটালি তাঁহার অস্ত্র হইয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু এই নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রা তাঁহার রহিল না। মোবারক জন্মিবার কিছুদিন পরে সহসা একদিন খ্‌ৱাজা নজরের জীবনযাত্রা ওলট-পালট হইয়া গেল। ফৌজদার অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। খ্‌ৱাজা নজরের সুখের দিন ফুরাইল।

হিন্দুস্থানের অধীশ্বর শাহেনশাহ বাদশাহ সাজাহান বাহ্যতঃ বিলাসী ও বহুব্যয়ী প্রতীয়মান হইলেও অন্তরে কৃপণ ছিলেন। এই জন্যই বোধ করি তিনি বহু ধনরত্ন সঞ্চয় করিয়া তাজমহল এবং ময়ূর সিংহাসন নির্মাণ করিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে নিয়ম ছিল, কোনও ওমরাহ্ বা রাজকর্মচারীর মৃত্যু হইলে মৃতের সঞ্চিত ধনসম্পত্তি তৎক্ষণাৎ সরকারে

বাজেয়াপ্ত হইত। আমীর-ওমরাহেরা এই ব্যবস্থায় মনে মনে সন্তুষ্ট ছিলেন না; সকলেই ধনরত্ন লুকাইয়া রাখিতেন কিম্বা মৃত্যুর পূর্বেই ওয়ারিশদের মধ্যে চুপি চুপি বণ্টন করিয়া দিতেন। গল্প আছে, এক ওমরাহ* দীর্ঘকাল রাজসরকারে কার্য করিয়া বহু ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ ওমরাহের মৃত্যু হইলে সাজাহান তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য রাজপুরুষদের পাঠাইলেন। ওমরাহের বাড়ীতে কিন্তু একটি তালাবন্ধ সিন্দুক ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া গেল না; রাজপুরুষেরা সিন্দুক সাজাহানের সম্মুখে উপস্থিত করিল। সাজাহান তালা ভাঙ্গিয়া দেখিলেন সিন্দুকের মধ্যে কেবল ছেঁড়া জুতা ভরা রহিয়াছে। সম্রাট লজ্জা পাইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার স্বভাব পরিবর্তিত হয় নাই।

ফৌজদারের বেলায় নিয়মের ব্যতিক্রম হইল না। তিনি যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন পাটনা হইতে সুবেদারের লোক আসিয়া তুলিয়া লইয়া গেল। দুর্গে নূতন ফৌজদার আসিল। খ্‌াজা নজর রিক্তহস্তে পথে দাঁড়াইলেন।

যাহার রণশিক্ষা নাই সে কোন্ কাজ করিবে? শেষ পর্যন্ত শিল্প-বিদ্যাই তাঁহার জীবিকা হইয়া দাঁড়াইল। ঘরানা ঘরের সন্তান, অবস্থা বিপাকে দুর্দশায় পতিত হইয়াছেন—তাই সহরের গণ্যমান্য সকলেই তাঁহাকে সাধ্যমত সাহায্য করিল।

গত বিশ বছরে খ্‌াজা নজরের অবস্থা কিছু সচ্ছল হইয়াছে। তিনি এখন সাধারণ গৃহস্থ, সহরের প্রান্তে ক্ষুদ্র বাড়ী করিয়াছেন। সুখে দুঃখে জীবন চলিতেছে। পত্নীর মৃত্যু হইয়াছে, মোবারকের বিবাহ হইয়াছে। খ্‌াজা নজরের জীবনে বড় বেশী উচ্চাশা নাই, কেবল একটি আকাঙ্ক্ষা অহরহ তাঁহার অন্তরে জাগিয়া থাকে। মোবারক বড় হইয়া উঠিয়াছে,

* নেকনাম খাঁ। (বার্নিয়ার)

এইবার একদিন তাহাকে দিল্লী পাঠাইবেন। মোবারক বাদশাহের নিকট হইতে আবার ফৌজদারীর সনদ লইয়া আসিবে।

মোবারককে বালককাল হইতে খ্বাজা নজব সৎশিক্ষা দিয়াছেন, কুসঙ্গ হইতে সযত্নে দূবে রাখিয়াছেন। আরবী ও পারসী ভাষায় সে পারদর্শী হইয়াছে। যুদ্ধবিদ্যায় যদিও তাহাব বিশেষ রুচি নাই—সেও তাহার পিতাব মত কল্পনাপ্রবণ—তবু তাহাকে যথারীতি অস্ত্রবিদ্যা শিখানো হইয়াছে। তাহার উপর অমন সুন্দর চেহাবা! সে যদি একবার বাদশাহের সিংহাসনতলে গিয়া দাঁড়াইতে পারে, বাদশাহ তাহার আশা পূর্ণ না করিযা পারিবেন?

এই আকাঙ্ক্ষা বুকে লইয়া খ্বাজা নজর পুত্রকে বড় করিয়া তুলিয়াছেন —ইহা ভিন্ন তাঁহার জীবনে অন্য কামনা নাই। মোবারকের কুড়ি বছর বয়স পূর্ণ হইবার পর তিনি তাহাব দিল্লী গমনের উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সহসা বাদশাহেব পীড়া ও ভ্রাতৃযুদ্ধের সংবাদ আসিয়া চারিদিকে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। মোবারকের দিল্লী গমন আপাততঃ স্থগিত আছে।

সেদিন অপরাহ্ণে মোবারক রিক্তহস্তে গঙ্গাতীর হইতে বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, তাহার পিতা কারখানার চালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একব্যক্তির সহিত কথা কহিতেছেন। সহরের ধনী বেনিয়া চুনীচন্দের পুত্রের বড় অসুখ, সে মিয়াসায়েবের কাছে মন্ত্রপড়া জল লইতে আসিয়াছে। মিয়া-সাহেবের জলপড়ার ভারি গুণ, কখনও ব্যর্থ হয় না। তিনি মন্ত্রপুত জলের বাটি চুনীচন্দের হাতে দিয়া বলিলেন,—"যাও। ছেলে আরাম হলে পীর শানফার দরগায় শিরনি চড়িও।" বলিয়া চুনীচন্দকে বিদায় দিলেন।

মোবারক এই ফাঁকে অলক্ষিতে গৃহে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছিল, খ্‌াজা নজর ডাকিলেন,—"মোবারক!"

মোবারক ফিরিয়া আসিয়া পিতার সম্মুখে দাঁড়াইল। তিনি স্নিগ্ধচক্ষে একবার তাহার মুখের পানে চাহিলেন; রৌদ্রে ধুলায় মোবারকের মুখ-খানি আরক্ত হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিলেও সে-কথার উল্লেখ না করিয়া বলিলেন,—"কিছু খবর শুনলে? শহরে নাকি আবার ফৌজ এসেছে?"

মোবারক বলিল,—"হ্যাঁ, সুলতান সুজা ফিরে এসেছে।"

খ্‌াজা নজর একটু বিমনা ভাবে আকাশের পানে চাহিলেন, ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হইল। কিন্তু তিনি আর কোনও প্রশ্ন না করিয়া কারখানার চালার ভিতর প্রবেশ করিলেন। চালার ভিতর হইতে তাঁহার অন্যমনস্ক কণ্ঠস্বর আসিল,—"যাও, তুমি স্নান কর গিয়ে।"

মোবারক তখন বাড়ীতে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিবার পূর্বেই দেখিতে পাইল, দ্বারের আড়ালে পরী দাঁড়াইয়া আছে এবং অপূর্ব সুন্দর চোখ দুটিতে দুষ্টামি ভরিয়া হাসিতেছে। মোবারকও হাসিয়া ফেলিল। পরী আজ কোনও ছলছুতা মানিবে না, বাজির পণ পুরামাত্রায় আদায় করিয়া লইবে।

৪

সুলতান সুজার নৌবহর গঙ্গার স্রোত বাহিয়া আসিয়াছিল; তাঁহার স্থলসৈন্য—পিয়াদা ও সওয়ার গঙ্গার তীর ধরিয়া অগ্রসর হইতেছিল। নৌকায় স্বয়ং সুজা ছিলেন, তাঁহার অগণিত নারীপূর্ণ হারেম ছিল, আর ছিল বড় বড় কামান গোলা বারুদ। যে কয়জন আমীর এখনও তাঁহার সংসর্গ ত্যাগ করেন নাই তাঁহারাও নৌকায় ছিলেন।

মুঙ্গেরে অবতীর্ণ হইয়া সুজা কেল্লার মধ্যে ফৌজদারের বাসভবনে অধিষ্ঠিত হইলেন। দুর্গের পশ্চিমভাগে উচ্চভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত দুইটি বড় বড় মহাল ; একটিতে সুজার হারেম রহিল, অপরটি তাঁহার দরবার ও মন্ত্রণাগৃহে পরিণত হইল। সুজার প্রধান উজির আলাবর্দি খাঁর জন্যও উৎকৃষ্ট বাসভবন নির্দিষ্ট হইল। আলাবর্দি খাঁ সুজার অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন, সুজা আদর করিয়া তাঁহাকে 'খাঁন্ ভাই' বলিয়া ডাকিতেন! তিনি 'করণ-চূড়া' নামক কেল্লার উত্তরভাগের একটি সুন্দর শৈলগৃহ অধিকার করিলেন। সৈন্যদল মাঠে ময়দানে তাম্বু ফেলিল ; কতক নৌকায় রহিল।

মুঙ্গেরে পৌছিয়া সুলতান সুজা একদণ্ডও বৃথা কালক্ষয় করিলেন না, প্রবল উৎসাহে দুর্গসংস্কার আরম্ভ করিয়া দিলেন। পাটনা হইতে আসিবার পথে তিনি স্থির করিয়াছিলেন, মুঙ্গেরের দুর্ধর্ষ দুর্গেই তাঁহার শক্তির কেন্দ্র রচনা করিবেন। যদিও রাজমহল তাঁহার রাজধানী, তবু রাজমহল আগ্রা হইতে অনেক দূর ; মুঙ্গের অপেক্ষাকৃত নিকট। যাঁহার দৃষ্টি ময়ুর সিংহাসনের উপর নিবদ্ধ তাঁহার পক্ষে রাজমহল বা ঢাকা অপেক্ষা মুঙ্গেরে ঘাঁটি তৈয়ার করিবার ইচ্ছাই স্বাভাবিক। সুজার আদেশে ও তত্ত্বাবধানে কেল্লার প্রাকার মেরামত হইতে লাগিল, পরিখা আরও গভীরভাবে খনন করিয়া গঙ্গার ধারার সহিত তাহার নিত্যসংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা হইল। দুর্গপ্রাকারের বুরুজের উপর বড় বড় কামান বসিল। সুজা অশ্বপৃষ্ঠে চারিদিকের বিপুল কর্মতৎপরতা তদারক করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সুজার সঙ্গী-সাথীরা তাঁহার এই অপ্রত্যাশিত কর্মোৎসাহ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। যাঁহারা বুদ্ধিমান তাঁহাদের সন্দেহ হইল, সুজা কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঔরংজেবকে অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

একচল্লিশ বছর বয়সে সুজার চরিত্র সংশোধনের আর উপায় ছিল

না। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমান ছিলেন, কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী ব্যসনাশক্তি তাঁহার বুদ্ধি ও দেহের উপর জড়তার প্রলেপ মাখাইয়া দিয়াছিল। তৈমুর-বংশের রক্তে তিনটি প্রধান উপাদান—বিবেকহীন উচ্চাশা, অদম্য ভোগ-লিপ্সা এবং কুটিল নৃশংসতা। সকল মোগল সম্রাটের মধ্যেই এই প্রবৃত্তি-গুলি অল্পাধিক অনুপাতে বিদ্যমান ছিল। সুজার জীবনে ভোগলিপ্সাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু তাই বলিয়া উচ্চাশাও তাঁহার কম ছিল না। মাঝে মাঝে তাহা খড়ের আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিত; তীব্র সর্পিল বুদ্ধি জড়ত্বের খোলস ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিত। কিন্তু তাহা ক্ষণিক। ঔরংজেবের ন্যায় লৌহদৃঢ় চিত্তবল তাঁহার ছিল না। আবার তিনি আলস্যে বিলাসে গা ভাসাইয়া দিতেন।

কিন্তু মুঙ্গেরে পৌঁছিয়া তিনি এমন বিপুল উদ্যমে কাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন যে সাতদিনের মধ্যে দুর্গের জীর্ণ সংস্কার শেষ হইল। কেবল দুর্গ মেরামত করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, শত্রু যাহাতে দুর্গের কাছে না আসিতে পারে তাহার ব্যবস্থাও করিলেন। জলপথে অবশ্য সুজার কোনও ভয় ছিল না, কারণ সে-সময় বাংলার অধীশ্বর সুজা ভিন্ন আর কাহারও নৌবহর ছিল না। স্থলপথে মুঙ্গের আক্রমণের পথ পূর্ব ও দক্ষিণ হইতে; তাহাও গিরিশ্রেণীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। কিন্তু গিরিশ্রেণীর ফাঁকে ফাঁকে সৈন্য চালনার উপযোগী রন্ধ্র আছে। সুজা এই রন্ধ্রগুলি বড় বড় বাঁধ তুলিয়া বন্ধ করিয়া দিবার বন্দোবস্ত করিলেন। সুজা সত্যই রণপণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং মুঙ্গের কেল্লা ও পারিপার্শ্বিক ভূমি সংরক্ষণের কোনই ত্রুটি রহিল না।

হাজার হাজার মজুর লাগিয়া গেল। পাহাড়ের ব্যবধানস্থলে উচ্চ

জাঙ্গাল খাড়া হইল, তাহার মাথার উপর কামান বসিল। সুজা ঘোড়ার পিঠে সমস্ত পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বন্ধু এবং উজির খান্ ভাই আলাবর্দি খাঁ সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে রহিলেন।

সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার সময় সুজার মহালে দরবার বসিত। দরবার অবশ্য পাকা দরবার নয়, আদব কায়দার কড়াকড়ি ছিল না; অনেকটা মজলিসের মত আসর বসিত, আলাবর্দি খাঁ, মির্জা জান বেগ প্রমুখ কয়েকজন অন্তরঙ্গ পারিষদ আসিয়া বসিতেন। মখমল বিছানো বৃহৎ কক্ষে বহু তৈলদীপের আলোতে শিরাজি চলিত, হাস্য পরিহাস চলিত, ক্বচিত মন্ত্রণা পরামর্শও হইত। রাত্রি যত গভীর হইত সুজা ততই মাতাল হইয়া পড়িতেন, কিন্তু পরদিন প্রাতঃকালে আবার তিনি অশ্বপৃষ্ঠে বাহির হইতেন। পারিষদেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া ভাবিতেন, এভাবে আর কতদিন চলিবে!

এইভাবে একপক্ষ কাটিল।

একদিন সন্ধ্যার পর মজলিস বসিয়াছিল। সুজার হাতে শিরাজির পাত্র ছিল, তিনি ফৌজদারের পানে চাহিয়া বলিলেন,—"পীর পাহাড়ের দিকে কাজ কেমন চলছে?"

ওদিকের কার্য-তত্ত্বাবধানের ভার ফৌজদার মহাশয়ের উপর ছিল, তিনি বলিলেন,—"ভালই চলছে জাহাঁপনা, ঘাঁটি প্রায় তৈরী হয়ে গেছে।"

সুজা বলিলেন,—"বেশ, কাল ওদিকে তদারক করতে যাব।"

স্ফটিকের পানপাত্র নিঃশেষ করিয়া তিনি বাঁদীর হাতে ফেরৎ দিলেন। কয়েকজন যুবতী বাঁদী শরাবের পাত্র, তাম্বুলের পেটি ও গোলাপজল ভরা গুলাবপাশ লইয়া মজ্লিসের পরিচর্যা করিতেছিল। সুজার ইঙ্গিতে একটি

বাঁদী ফৌজদারের সম্মুখে পানের বাটা ধরিল। সম্মানিত ফৌজদার তস্‌লিম করিয়া একটি তবক্-মোড়া পান তুলিয়া লইলেন।

শরাবের আর একটি পাত্র হাতে লইয়া সুজা বলিলেন,—"আমার শরাবের পুঁজি তো প্রায় ফুরিয়ে এল। ফৌজদার সাহেব, আপনাদের দেশে মদ পাওয়া যায় না?"

ঈষৎ হাসিয়া ফৌজদার বলিলেন,—"পাওয়া যায় হজরৎ—তাড়ি।"

সুজা প্রশ্ন করিলেন,—"তাড়ি? সে কি রকম জিনিষ?"

ফৌজদার বলিলেন,—"মন্দ জিনিষ নয়। গ্রীষ্মকালে এদেশের ইতর-ভদ্র সকলেই খায়। স্বাস্থ্যের পক্ষে বেশ ভাল। কিন্তু বড় দুর্গন্ধ।"

সুজা হাসিয়া বলিলেন,—"আন্দাজ হচ্চে ফৌজদার সাহেব তাড়ি চেখে দেখেছেন!"

ফৌজদার কহিলেন,—"জী। পুদিনার আরক একটু মিশিয়ে দিলে গন্ধ চাপা পড়ে—তখন মন্দ লাগে না।"

ক্রমে রাত্রি হইল। সুজা কিংখাপের তাকিয়ার উপর এলাইয়া পড়িলেন, তাহার কথা জড়াইয়া আসিতে লাগিল। বাঁদীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল।

আলাবর্দি খাঁ বুঝিলেন, আজ রাত্রে সুজা হারেমে ফিরিবেন না। তিনি অন্য পারিষদবর্গকে চোখের ইসারা করিলেন, সকলে কুরনিশ করিয়া বিদায় হইলেন।

দরবারকক্ষের পর্দা-ঢাকা দ্বারের বাহিরে হাব্‌সী খোজারা নাঙ্গা তলোয়ার লইয়া পাহারা দিতেছে। তাহারা আমীরগণকে এত শীঘ্র বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়া নিঃশব্দে দাঁত বাহির করিয়া হাসিল। তাহারা পুরাতন ভৃত্য, প্রভুর স্বভাব চরিত্র ভাল করিয়াই জানে।

৮

পরদিন আমাদেব আখ্যায়িকার একটি স্মরণীয় দিন ; যদিও ইতিহাস উহা স্মরণ করিয়া রাখে নাই।

পূর্বাহ্ণে সুজা আলাবর্দি খাঁকে সঙ্গে লইয়া ঘোড়ার পিঠে পীর পাহাড় পরিদর্শনে বাহিব হইলেন। পরিদর্শন কার্যে সুজা সাধারণ বেশবাস পরিয়াই বাহির হইতেন, সঙ্গে রক্ষী থাকিত না। কেবল খাঁন ভাই আলাবর্দি খাঁ এই সকল অভিযানে তাঁহার নিত্যসঙ্গী ছিলেন।

আলাবর্দি খাঁ একজন অতি মিষ্টভাষী চাটুকার ছিলেন ; তাঁহার চাটুকথার বিশেষ গুণ এই ছিল যে উহা সহসা চাটুকথা বলিয়া চেনা যাইত না। সুজা আখেরে দিল্লীর সম্রাট্ হইবেন এই আশায় তিনি সুজার সহিত যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু পরে যখন সে আশা আর রহিল না তখন তিনি সুজার সৈন্য ভাঙাইয়া লইয়া পালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুজা তাঁহাকে ধৃত করিয়া প্রকাশ্যে তাঁহার মুণ্ডচ্ছেদ করাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা আরও কিছুদিন পরের কথা।

দ্বিপ্রহবে পীর পাহাড় পৌঁছিয়া সুজা কার্যাদি তদারক করিলেন। পীর পাহাড় শহরের পূর্বদিকে গঙ্গার সন্নিকটে গম্বুজাকৃতি একটি টিলা ; স্বভাবতই সুরক্ষিত। তাহার শীর্ষদেশ সমতল করিয়া তাহার উপর আর একটি গম্বুজের মত মহাল উঠিতেছে। ইহা সুজার আতিস্‌-খানা হইবে— গোলাবারুদ প্রভৃতি এখানে সঞ্চিত থাকিবে। টিলার চূড়া হইতে একটি কূপও খনিত হইতেছে ; গঙ্গার স্রোতের সহিত তাহার যোগ থাকিবে।

আত্মরক্ষার বিপুল আয়োজন। শত শত মজুর রাজমিস্ত্রি ছুতার কাজ করিতেছে।

পরিদর্শন শেষ করিতে অপরাহ্ণ হইয়া গেল। সুজা ও আলাবর্দি খাঁ ফিরিয়া চলিলেন। ভাগ্যক্রমে আজ বালি উড়িতেছে না, খর রৌদ্রতাপে বাতাস শুব্ধ হইয়া আছে।

অর্ধেক পথ অতিক্রম করিতে সুজা ঘর্মাক্ত কলেবর হইলেন, সূর্য পশ্চিমে ঢলিয়াছে, মুখের উপর রৌদ্র পড়িয়া মুখ রক্তবর্ণ হইল। শহরের উপকণ্ঠে যখন পৌছিলেন তখন তৃষ্ণায় তাঁহার গলা শুকাইয়া গিয়াছে।

একটি নিম্নশ্রেণীর লোক অপর্যাপ্ত তাড়ি সেবন করিয়া মনের আনন্দে পথের এধার হইতে ওধার পরিভ্রমণ করিতে করিতে চলিয়াছিল। সুজা ঘোড়া থামাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখানে কোথায় পানীয় পাওয়া যায় বলতে পার ?"

পথিক হাস্যবিম্বিত মুখে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল,—"ঐ যে পূরব সরাই, ঐখানে ঢুকে পড়ুন, দেদার তাড়ি পাবেন।" বলিয়া প্রসন্ন একটি হিক্কা তুলিয়া প্রস্থান করিলেন।

আলাবর্দি খাঁ ও সুজা দৃষ্টি বিনিময় করিলেন। সুজা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"আসুন খান্ ভাই, এদেশের খাঁটি জিনিষ চেখে দেখা যাক।"

পূরব সরাই নেহাৎ নিম্নশ্রেণীর পানশালা নয়; তবে গ্রীষ্মকালে এখানে তাড়ি বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। সত্বাধিকারী একজন মুসলমান; দুইজন ফৌজী সওয়ারকে পাইয়া সে সাদরে তাহাদের অভ্যর্থনা করিল। সুজা পুদিনার আরক-সুরভিত তাড়ি ফরমাস দিলেন।

নূতন মাটির ভাঁড়ে শুভ্রবর্ণ পানীয় আসিল। উভয়ে পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন। শুষ্ককণ্ঠে নূতনতর পানীয় মন্দ লাগিল না। তারপর সরাইওয়ালা যখন এক রেকাবি ঝাল-মটর আনিয়া উপস্থিত করিল, তখন সুজা আবার পানীয় ফরমাস করিলেন।

ঝাল-মটর স্থজার বড়ই মুখরোচক লাগিল। এরূপ প্রাকৃতজনোচিত আহার্য পানীয়ের আস্বাদ স্থজা পূর্বে কখনও গ্রহণ করেন নাই, তিনি খুব আমোদ অনুভব করিলেন। পানীয়ের দ্বিতীয় পাত্রও ঝাল-মটর সহযোগে শীঘ্রই নিঃশেষিত হইল।

কোমরবন্ধের তরবারি আল্‌গা করিয়া দিয়া স্থজা তৃতীয় কিস্তি পানীয় হুকুম করিলেন। আলাবর্দি খাঁর দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন,—"কী খান্ ভাই, কেমন লাগছে ?"

খান্ ভাই মাথা নাড়িয়া মোলায়েম ভর্ৎসনার স্থরে বলিলেন,—"হজরৎ, আপনি গরীবের ফুর্তির দাম বাড়িয়ে দিলেন।"

এক ঘড়ি সময় কাটিবার পর স্থজা ও আলাবর্দি যখন সরাইখানা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন তখন তাহাদের মনের বেশ আনন্দঘন অবস্থা। উভয়ে আবার ঘোড়ার উপরে উঠিয়া যাত্রা করিলেন।

কিন্তু বেশী দূর যাইবার আগেই তাঁহাদের গতি ভিন্নমুখী হইল। আরোহীদ্বয়ের তৃষ্ণা নিবারণ হইয়াছিল বটে কিন্তু ঘোড়া দুটি তৃষ্ণার্তই ছিল ; তাই চলিতে চলিতে পথের অনতিদূরে একটি জলাশয় দেখিতে পাইয়া তাহারা হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল এবং বল্‌গার শাসন উপেক্ষা করিয়া সেই দিকে চলিল। স্থজা ঘোড়ার মুখ ফিরাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ঘোড়া বাগ মানিল না। তখন তিনি আর চেষ্টা না করিয়া লাগাম আলগা করিয়া ধরিলেন।

কিন্তু দীঘির তীরে পৌছিয়া আবার তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে রাশ টানিতে হইল। দীঘির পাড় বড় বেশী ঢালু, ঘোড়া নামিবার স্থবিধা নাই ; একটি সঙ্কীর্ণ ঘাট আছে বটে কিন্তু তাহার ধাপগুলি এতই সরু এবং উঁচু যে ঘোড়া সেপথে অতিকষ্টে নামিতে পারিলেও উঠিতে পারিবে না। স্থজা

ও আলাবর্দি খাঁ দ্বিধায় পড়িলেন। ঘোড়াদুটি জলের সান্নিধ্যে আসিয় আরও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া একপ্রকার অসম্ভব!

একটি লোক জলের কিনারায় বসিয়া নিবিষ্টমনে ছিপ দিয়া মাছ ধরিতেছিল; ঘাটে বা দীঘির আশে-পাশে আর কেহ ছিল না। তাহার পিছনে পাড়ের উপর সুজা ও আলাবর্দি খাঁ উপস্থিত হইলে সে একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিয়া আবার মাছ ধরায় মন দিয়াছিল; ফৌজী সওয়ার সম্বন্ধে তাহার মনে কৌতূহল ছিল না।

এদিকে সুজার মনের প্রসন্নতাও আর ছিল না। ঘোড়ার ব্যবহারে তিনি বিরক্ত হইয়াছিলেন; পুকুর পাড়ে ঘোড়ার জলপানের কোনও সুবিধাই নাই দেখিয়া তাঁহার বিরক্তি ক্রমে ক্রোধে পরিণত হইতেছিল। তার উপর ঐ লোকটা নির্বিকারচিত্তে বসিয়া মাছ ধরিতেছে, তাঁহাকে সাহায্য করিবার কোনও চেষ্টাই করিতেছে না। দিল্লীর ভবিষ্যৎ বাদশাহ শাহজাদা আলমের ধৈর্য আর কতক্ষণ থাকে? তিনি কর্কশকণ্ঠে মৎস্য-শিকাররত লোকটিকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"এই বান্দা, পুকুরে ঘোড়াকে জল খাওয়াবার কোনও রাস্তা আছে?"

মৎস্যশিকারী মোবারক। সম্বোধন শুনিয়া তাহার রক্ত গরম হইয়া উঠিল। কিন্তু এই অশিষ্ট দায়িত্বহীন সিপাহীগুলার সহিত কলহ করিয়া লাভ নাই, তাহাতে নিগ্রহ বাড়িবে বৈ কমিবে না। বিশেষতঃ মোবারক নিরস্ত্র। সে আর-একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিয়া আবার ফাৎনার উপর চোখ রাখিল।

সুজা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। অবহেলায় তিনি অভ্যস্ত নন; তাই তিনি যে ছদ্মবেশে আছেন সেকথা ভুলিয়া গিয়া চীৎকার করিয়া

বলিলেন,—"আরে বাঁদীর বাচ্চা! তুই কানে শুনতে পাস না? বদ্‌তমিজ, এদিকে আয়।"

ইহার পরে আর চুপ করিয়া থাকা যায় না। মোবারক আরক্ত মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল, ছিপটা হাতে তুলিয়া পাড় বাহিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। ঘোড়ার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে সুজার পানে চাহিয়া রহিল, তারপর অর্ধাবরুদ্ধ ক্রোধের স্বরে বলিল,—"বাঁদির বাচ্চা তুমি। তোমার শরীরে ভদ্র-রক্ত থাকলে ভদ্রভাবে কথা বলতে।"

আলাবর্দি একেবারে হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিলেন—"বেয়াদব যুবক। তুমি কার সঙ্গে কথা কইছ জানো? উনি সুলতান সুজা।"

নাম শুনিয়া মোবারকের বুকে মুগুরের ঘা পড়িল। সে বুঝিল তাহার জীবনে এক ভয়ঙ্কর মুহূর্ত উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু তবু এখন ভয়ে পিছাইয়া যাইতে সে ঘৃণাবোধ করিল। অকারণ লাঞ্ছনার গ্লানি তাহার আরও বাড়িয়া গেল; নীচ শ্রেণীর লোকের মুখে ইতর ভাষা বরং সহ্য হয় কিন্তু বড়'র মুখে ছোট কথা দ্বিগুণ পীড়াদায়ক। মোবারকের মুখে একটা ব্যঙ্গ-বঙ্কিম বিকৃতি ফুটিয়া উঠিল, সে বলিল,—"সুলতান সুজা ছোট ভাইয়ের কাছে যুদ্ধে মার খেয়ে এখন নিরস্ত্রের ওপর বাহাদুরী দেখাচ্ছেন!"

সুজার অন্তরে যে-গ্লানি প্রচ্ছন্ন ছিল, যাহার ইঙ্গিত পর্যন্ত করিতে ওমরাহেরা সাহস করিতেন না, তাহাই যেন শ্লেষের চাবুক হইয়া তাঁহার মুখে পড়িল। আর তাঁহার দিগ্‌বিদিক জ্ঞান রহিল না, উন্মত্ত রোষে তরবারি বাহির করিয়া তিনি মোবারকের পানে ঘোড়া চালাইলেন।

"গোস্তাক্। বদ্‌বখ্‌ত—।"

ইতিমধ্যে ভোজবাজির মত কোথা হইতে অনেকগুলি লোক আসিয়া জুটিয়াছিল, তাহারা সমস্বরে হৈ হৈ করিয়া উঠিল। কেহ বা মোবারককে

পলায়ন করিবার উপদেশ দিল ; মোবারক কিন্তু এক পা পিছু হটিল না। ঘোড়া যখন প্রায় তাহার বুকের উপর আসিয়া পড়িয়াছে তখন সে একবার সজোরে ছিপ চালাইল। ছিপের আঘাত শপাৎ করিয়া সুজার গালে লাগিল।

সুজাও বেগে তরবারি চালাইলেন। মোবারকের গলদেশে তরবারির ফলা বসিয়া গেল। সে বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া মাটিতে পড়িল।

কয়েক মুহূর্ত পূর্বে যাহা চিন্তার অতীত ছিল, অতি তুচ্ছ কারণে অকস্মাৎ তাহাই ঘটিয়া গেল।

৬

দিন শেষ হইয়া আসিতেছে।

খ্‌াজা নজর বোখারী তাঁহার কারখানা ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চুনীচন্দ্‌ বেনিয়ার সহিত হাসিমুখে কথা বলিতেছিলেন। চুনীচন্দের পুত্র আরোগ্যলাভ করিয়াছে, তাই সে মিঞা সাহেবকে কৃতজ্ঞতা জানাইতে আসিয়াছে।

সহসা রাজপথের উপর অনেকগুলি মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। খ্‌াজা নজর চোখ তুলিয়া দেখিলেন একদল লোক একটি মৃতদেহ বহন করিয়া আনিতেছে, তাহাদের পশ্চাতে দুইজন সওয়ার। খ্‌াজা নজর শঙ্কিত হইয়া ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিলেন।

মৃতদেহের বাহকগণ খ্‌াজা নজরের অঙ্গনে প্রবেশ করিল। খ্‌াজা নজর নিশ্চল মূর্তির মত দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। বাহকেরা মোবারকের রক্তাক্ত মৃতদেহ আনিয়া খ্‌াজা নজরের সম্মুখে একটি

পাথরের পাটার উপর শোয়াইয়া দিল। কেহ কথা কহিল না। খ্বাজা নজর নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার রক্তহীন অধর একটু নড়িল, "মোবারক—"

যাহারা বহন করিয়া আনিয়াছিল তাহারা নিঃশব্দে অশ্রুমোচন করিয়া সরিয়া গেল। কেবল অশ্বারোহী দুইজন গেল না। সুজার মুখে ক্রোধের অন্ধকার এখনও দূর হয় নাই, চোখে জিঘাংসা ধিকিধিকি জ্বলিতেছে। তাঁহার গালে ছিপের আঘাত চিহ্নটা ক্রমে বেগুনী বর্ণ ধারণ করিতেছে। তিনি মাঝে মাঝে তাহাতে হাত বুলাইতেছেন এবং তাঁহার চক্ষু হিংস্রভাবে জ্বলিয়া উঠিতেছে।

সহসা সুজা খ্বাজা নজরকে উদ্দেশ করিয়া কঠোর কণ্ঠে বলিলেন,—"তুমি এর বাপ ?"

খ্বাজা নজর সুজার দিকে শূন্য দৃষ্টি তুলিলেন, কথা কহিলেন না। মোবারক তো বন্সী তালাওয়ে মাছ ধরিতে গিয়াছিল···!

উত্তর না পাইয়া আলাবর্দি খাঁ বলিলেন,—"ইনি মালিক উল্‌মুল্‌ক সুলতান সুজা। তোমার ছেলে এঁর অমর্যাদা করেছিল তাই তার এই দশা হয়েছে।"

খ্বাজা নজর এবারও উত্তর দিলেন না, ভাবহীন নিস্তেজ চক্ষু অশ্বারোহীদের উপর হইতে সরাইয়া মোবারকের উপর ন্যস্ত করিলেন। দেখিলেন পাথরের পাটা মোবারকের কণ্ঠ-ক্ষরিত রক্তে ভিজিয়া উঠিয়াছে। মোবারক বাঁচিয়া নাই·········ইহারা তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে—

সুজা মুখের একটা বিকৃত ভঙ্গী করিলেন। এই সামান্য প্রস্তর-শিল্পীর পুত্রকে হত্যা করিবার পর ইহার অধিক কৈফিয়ৎ বা দুঃখ প্রকাশের প্রয়োজন নাই। সুজা আলাবর্দিকে ইঙ্গিত করিলেন; উভয়ে ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

এই সময় বাড়ীর ভিতর হইতে তীব্র আর্তোক্তি আসিল, সঙ্গে সঙ্গে পরীবানু ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। তাহার কেশ বিস্রস্ত, বোধকরি ভয়ঙ্কর সংবাদ শুনিবার সময় সে কেশ প্রসাধন করিতেছিল ; অঙ্গে ওড়্নি নাই, কেবল চোলি ও ঘাঘ্রি। সে ছুটিয়া আসিয়া মোবারকের মৃত-দেহের পাশে ক্ষণেক দাঁড়াইল, ব্যাকুল বিস্ফারিত নেত্রে মোবারকের মৃত্যুস্থির মুখের পানে চাহিল, তারপর ছিন্নলতার মত তাহার বুকের উপর আছড়াইয়া পড়িল। খ্বাজা নজর মোহগ্রস্ত মূকের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সুজা ঘোড়ার পৃষ্ঠ হইতে ঘাড় ফিরাইয়া এই দৃশ্য দেখিলেন ; কিছুক্ষণ নিষ্পলক নেত্রে পরীবানুর পানে চাহিয়া রহিলেন। সামান্য মানুষের গৃহেও এমন স্ত্রীলোক পাওয়া যায় ? পানা পুকুরে মরালী বাস করে ?

সুজার সমসাময়িক ইতিকার লিখিয়াছেন, চামেলির মত ক্ষুদ্র বস্তু সুজার চোখে পড়িত না। আজ কিন্তু এই শিশির-সিক্ত চামেলী ফুলটি ভাল করিয়াই তাঁহার চোখে পড়িল। সন্ধ্যার ছায়ালোকে তিনি যখন দুর্গের দিকে ফিরিয়া চলিলেন, তখনও ঐ শোক-নিপীড়িতার যৌবনোচ্ছল লাবণ্য তাঁহার চিত্তপটে ফুটিয়া রহিল।

দুর্গের সিংহদ্বারে প্রবেশ করিতে সুজা বলিলেন,—"বুড়ো বান্দাটা পাথরের কারিগর মনে হল।"

আলাবর্দি বলিলেন, "হাঁ হজরৎ, আমারও তাই মনে হল।" বলিয়া সুজার পানে অপাঙ্গে চাহিলেন।

সুজা চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া গণ্ডের স্ফীত কৃষ্ণবর্ণ আঘাত চিহ্নটার উপর অঙ্গুলি বুলাইলেন।

তাঁহার দৃষ্টি ছুরির নখাগ্রের মত ঝিলিক দিয়া উঠিল।

*　　*　　*　　*　　*

পরদিন সন্ধ্যাকালে খ্বাজা নজরের গৃহে অনৈসর্গিক নীরবতা বিরাজ করিতেছিল। অন্তঃপুরে শব্দমাত্র নাই, যেন সেখানে মানুষ বাস করে না; পরীবানু শোকের কোন্ নিগূঢ় গর্ভগৃহে আশ্রয় লইয়াছে। বাহিরের অঙ্গনও শূন্য নিস্তব্ধ; কেবল মোবারকের রক্তচর্চিত প্রস্তরপট্টের পানে চাহিয়া খ্বাজা নজর একাকী বসিয়া আছেন।

মোবারকের কফন দফন আজ প্রভাতেই হইয়া গিয়াছে। খ্বাজা নজর ভাবিতেছেন মোবারক নাই···কাল যে সুস্থ প্রাণপূর্ণ ছিল আজ সে নাই। বর্ষ কাটিবে, যুগ কাটিবে, পৃথিবী জীর্ণ হইয়া যাইবে, সূর্য ম্লান হইবে, চন্দ্র ধূলা হইয়া খসিয়া পড়িবে তবু মোবারক ফিরিয়া আসিবে না। এমন নিশ্চিহ্ন হইয়া কোথায় গেল সে? না, একেবারে নিশ্চিহ্ন নয়, ঐ যে পাথরের উপর তাহার শেষ মোহর-ছেপ্‌ৎ রাখিয়া গিয়াছে···শুষ্ক রক্ত ···পাথরে রক্তের দাগ কতদিন থাকে? ঘোড়ার খুরের শব্দে চোখ তুলিয়া খ্বাজা নজর দেখিলেন, কল্যকার একজন অশ্বারোহী আসিতেছে। তিনি ভাবিলেন, এ কে? সুল্‌তান সুজা? মোবারক তাঁহার সহিত ধৃষ্টতা করিয়াছিল সে ধৃষ্টতার ঋণ এখনও শোধ হয় নাই? তবে তিনি আবার কেন আসিলেন?

অশ্বারোহী কিন্তু সুজা নয়, আলাবর্দি খাঁ। আলাবর্দি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া খ্বাজা নজরের পাশে আসিয়া বসিলেন এবং এমনভাবে তাহার সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন যেন তিনি খ্বাজা নজরকে নিজের সমকক্ষ মনে করেন। সহানুভূতিতে বিগলিত হইয়া তিনি জানাইলেন, সুলতান সুজা কল্যকার ঘটনায় বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছেন। অবশ্য তিনি যেভাবে অপমানিত হইয়াছিলেন তাহাতে অপরাধীকে সবংশে বধ করিয়া

তাহাদের দেহ কুকুর দিয়া খাওয়াইলেও অন্যায় হইত না ; কিন্তু সুজার হৃদয় বড় কোমল, তিনি অন্যায় করেন নাই জানিয়াও কিছুতেই মনে শান্তি পাইতেছেন না। শোক-তপ্ত পরিবারের দুঃখ মোচন না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার বুকের দরদও দূর হইবেনা। সুলতান সুজা খবর পাইয়াছেন যে খ্‌াজা নজর একজন প্রসিদ্ধ শিল্পী। সুজার ইচ্ছা সম্রাট হইবার পর নূতন সিংহাসনে বসেন ; তাই তিনি অনুরোধ জানাইয়াছেন, খ্‌াজা নজর যদি একখানি মঙ্গলময় সিংহাসন তৈয়ারের ভার গ্রহণ করেন তাহা হইলে সুজা নিরতিশয় প্রীত হইবেন। পরম পরিমার্জিত ভাষায় এই কথাগুলি বলিয়া আলাবর্দি খাঁ এক মুঠি মোহর খ্‌াজা নজরের পাশে রাখিলেন।

খ্‌াজা নজরের মন তিক্ত হইয়া উঠিল ; তিনি ভাবিলেন, ইহারা কি মানুষ ! মোবারকের অভাব একমুঠি সোণা দিয়া পূর্ণ করিতে চায় ! মুখে বলিলেন,—"শাহজাদার ইচ্ছাই আদেশ, সিংহাসন তৈরি করে দেব।"

অতঃপর আরও কিছুক্ষণ মিষ্টালাপ করিয়া, তখ্‌ত যত শীঘ্র তৈয়ারী হয় ততই ভাল, এই অনু[illegible] জানাইয়া আলাবর্দি খাঁ প্রস্থান করিলেন।

আসন্ন রাত্রির ঘনায়মান অন্ধকারে খ্‌াজা নজর একাকী বসিয়া রহিলেন। কী নিষ্ঠুর ইহারা। অথচ ইহারাই শক্তিমান, ইহারাই সিংহাসনে বসে। ঈশ্বর ইহাদের এত শক্তি দিযাছেন কেন ? মোবারকের রক্তে যাহার হাত রাঙ্গা হইয়াছে আমি তাহারই জন্য মঙ্গলময় সিংহাসন তৈয়াব করিব ! মঙ্গলময় সিংহাসন—তক্ত্‌ মোবারক—!

ভাবিতে ভাবিতে খ্‌াজা নজর রক্তলিপ্ত পাথরের দিকে চাহিলেন। মনে হইল, শ্বেত পাথরের উপর গাঢ় রক্তের দাগ যেন প্রায়ান্ধকারে জ্বলিতেছে। খ্‌াজা নজরের দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, সূক্ষ্ম নাসাপুট ঘন ঘন

স্ফুরিত হইতে লাগিল। তিনি অস্ফুট স্বরে আবৃত্তি করিলেন,—"তক্ত্ মোবারক—তক্ত্ মোবারক—তক্ত্ মোবারক—"

ইহাই তক্ত্ মোবারকের ইতিহাস। কিন্তু আর একটু আছে। শুধুই রক্তমাখা পাথর এবং পিতার অভিশাপ লইয়া তক্ত্ মোবারক জন্মগ্রহণ করে নাই, তাহার উপর আরও গাঢ় পাপের প্রলেপ পড়িয়াছিল।

৭

তিন দিন পরে আলাবর্দি খাঁ আবার আসিলেন। খ্াজা নজর অপরাহ্নে কারখানায় চালার নীচে বসিয়া কাজ করিতেছিলেন; সিংহাসন প্রায় তৈয়ার হইয়াছে দেখিয়া আলাবর্দি খুশী হইলেন। কিন্তু আজ তিনি অন্য কাজে আসিয়াছিলেন, দুই চারিটি অবান্তর কথার পর কাজের কথা আরম্ভ করিলেন।

সুজার মনস্তাপ এখনও নিবৃত্ত হয় নাই। বস্তুতঃ মোবারকের বিধবা কবিলার কথা স্মরণ করিয়া তিনি মনে বড় কষ্ট পাইতেছেন; বিধবার মনে সুখ শান্তি ফিরাইয়া আনা তিনি অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেছেন। জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু প্রজাকে সুখী করাই রাজার ধর্ম। সুজা সদয় মনে ইচ্ছা করিয়াছেন যে মোবারকের কবিলা তাঁহার হারেমে আসিয়া বাস করুক; আরাম ও ঐশ্বর্যের মধ্যে থাকিয়া সে শীঘ্রই শোক ভুলিতে পারিবে। ইহাতে খ্াজা নজরেরও আনন্দ হওয়া উচিত; এরূপ সম্মান অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। ইত্যাদি।

খ্াজা নজরের বুকে বিষের প্রদাহ জ্বলিতে লাগিল। রাক্ষস—

রাক্ষস এরা! মোবারককে লইয়াছে, এখন আমার ইজ্জত লইতে চায়। আমি কি করিতে পারি? 'না' বলিলে জোর করিয়া লইয়া যাইবে। যাক—পরীকে লইয়া যাক। পরী আমার ঘরে কতদিনই বা থাকিবে? সে যুবতী, দু'মাসে হোক ছ'মাসে হোক আর কাহাকেও নিকা করিয়া চলিয়া যাইবে। তার চেয়ে এখনই যাক—

মুখে বলিলেন,—"আমি দাসানুদাস—রাজার যা ইচ্ছা তাই হোক।"

আলাবর্দি অশ্বারোহণে ফিরিযা গেলেন। সন্ধ্যার পর তিনটি ডুলি আসিয়া খ্বাজা নজরের বাড়ীর সদরে থামিল। সঙ্গে কয়েকজন বরকন্দাজ। দুইটি ডুলি হইতে চারিজন বাঁদী নামিয়া খ্বাজা নজরের অন্দরে প্রবেশ করিল। কিছুক্ষণ পরে পরীবানু কাঁদিতে কাঁদিতে চোখ মুছিতে মুছিতে বাঁদীদের সহিত বাহির হইয়া আসিল এবং ডুলিতে গিয়া বসিল। কানাৎ-ঢাকা তিনটি ডুলি বরকন্দাজ পরিবেষ্টিত হইয়া চলিয়া গেল।

রাত্রি হইল। খ্বাজা নজর কারখানা ঘরে আলো জ্বালিয়া কাজ করিতেছেন। তাঁহার দেহ নুইয়া পড়িয়াছে। বাটালি দিয়া সিংহাসনের গায়ে নাম খোদাই করিতেছেন আর মনে মনে চিন্তার অবশ ক্রিয়া চলিয়াছে—

মোবারকের বিবাহ···কতদিনের কথা? এইতো সেদিন···মুঙ্গের সহরে ১০৫২ সালের ২৭ শাবান তারিখে···দাসানুদাস খ্বাজা নজর বোখারী কর্ত্তৃক···

ঠক্ ঠক্ করিয়া বাটালির উপর হাতুড়ির ঘা পড়িতেছে; খ্বাজা নজরের মন কখনও অতীতের স্মৃতিতে ডুবিয়া যাইতেছে, কখনও কঠিন নির্ম্মম বর্ত্তমানে ফিরিয়া আসিতেছে—মোবারকের বিবাহের তারিখের সহিত তাহার মৃত্যুর তারিখ মিশিয়া যাইতেছে—

মধ্যরাত্রি পর্যন্ত খ্‌াজা নজর এইভাবে কাজ করিয়া চলিয়াছেন। যেমন করিয়া হোক আজই এই অভিশপ্ত সিংহাসন শেষ করিয়া দিতে হইবে। আর সহ্য হয় না—আর শক্তি নাই—

* * * * *

সিংহাসন দেখিয়া সুজা প্রীত হইলেন। দেখিতে খুব সুশ্রী নয়, কিন্তু কি যেন একটা অনৈসর্গিক আকর্ষণ উহাতে আছে। সুজা সিংহাসন লইয়া গিয়া দরবার কক্ষে বসাইলেন।

সন্ধ্যার সময় সভা বসিল। সুজা সিংহাসনের উপর মসলন্দ বিছাইয়া দুইপাশে মখমলের তাকিয়া লইয়া তাহাতে উপবেশন করিলেন। সভাসদেরা সহর্ষে কেরামৎ করিলেন। বাঁদীদের হাতে হাতে শরাবের পেয়ালা চলিতে লাগিল।

হাস্য পরিহাস রসালাপ চলিতেছে এমন সময় গুরুতর সংবাদ আসিল। পাটনা হইতে জলপথে দূত আসিয়াছে ; সে সংবাদ দিল, মীরজুম্‌লা ত্রিশ হাজার সৈন্য লইয়া স্থলপথে আসিতেছেন, শীঘ্রই মুঙ্গের অবরোধ করিবেন।

শরাবের পাত্র হাতে লইয়া সুজা দীর্ঘকাল নীরব হইয়া রহিলেন। তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আমি রাজমহলে ফিরে যাব। এখানে যুদ্ধ দেবনা।"

সকলে বিস্ময়াহত হইয়া চাহিয়া রহিলেন। এত আয়োজন এত পরিশ্রম করিয়া এ দুর্গ অজেয় করিয়া তোলা হইয়াছে, তাহা ছাড়িয়া পলায়ন করিতে হইবে ?

সুজা কহিলেন,—"আমার মন বলছে বাংলা দেশে ফিরে যেতে। আপনারা বাড়ী যান, আজ রাত্রিটা বিশ্রাম করুন। কাল সকাল থেকেই রাজমহল যাত্রার আয়োজন সুরু করতে হবে।"

সকলে অন্তরে ধিক্কার বহন করিয়া নীরবে প্রস্থান করিলেন। যাঁহারা সুজার বুলন্দ্ ইক্‌বালের উপর এখনও আস্থাবান ছিলেন তাঁহারাও বুঝিলেন সুজার পুরুষকার মহত্তর পুরুষকারের নিকট পরাস্ত হইয়াছে।

সুজাও অবসাদগ্রস্ত মনে আবার সিংহাসনে বসিলেন। কক্ষে বাঁদীর দল ছাড়া আর কেহ ছিলনা ; তাহারা কেহ তাঁহার সম্মুখে পানপাত্র ধরিল, কেহ ময়ূরপঙ্খী পাখা দিয়া ব্যজন করিল, কেহ বা পদমূলে বসিয়া তাঁহার পদসেবা করিতে লাগিল।

সুজা ভাবিতে লাগিলেন, ঔরংজেব আর মীরজুম্‌লা! এই দুটা মানুষ তাঁহার জীবনের দুর্গ্রহ। ইহাদের নাম শুনিলেই তাঁহার মন সঙ্কুচিত হয়, নিজেকে ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হয়, শক্তি অবসন্ন হয়। মীর-জুম্‌লার বিশ মণ হীরা আছে, সে যুদ্ধ করিতে আসে কেন? ঔরংজেব তাঁহার ছোট ভাই হইয়াও তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার করে কেন?

সুজার মনের আত্মগ্লানি ক্রমে জিঘাংসায় পরিণত হইতে লাগিল। কাহাকেও আঘাত হানিতে পারিলে গ্লানি কতকটা দূর হয়। চিন্তা-কুঞ্চিত মুখে বসিয়া তিনি নিজ গণ্ডস্থল অঙ্গুলি দিয়া স্পর্শ করিলেন। গণ্ডের আঘাত চিহ্নটা প্রায় মিলাইয়া গিয়াছে, তবু একটু কালো দাগ এখনও আছে। মোবারকের ছিপের দাগ। বাঁদীর বাচ্চা! বদ্‌জাৎ কুত্তা! তাহার প্রতি সুজার আক্রোশ এখনও সম্পূর্ণ নির্বাপিত হয় নাই— প্রতিহিংসার আগুনে পূর্ণাহুতি পড়ে নাই।

সুজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাল যে নূতন বাঁদীটা এসেছে তার কান্না থেমেছে?"

একটি বাঁদী বলিল,—"এখনও থামেনি হজরৎ, তেম্‌নি কেঁদে চলেছে।"

নিরানন্দ হাস্যে সুজার দন্তপংক্তি প্রকট হইল। তিনি বলিলেন,—

"তার কান্না আমি থামিয়ে দিচ্ছি। তোরা যা, তাকে এখানে পাঠিয়ে দে।"

বাঁদীরা চলিয়া গেল। তক্ত্ মোবারকের উপর অঙ্গ এলাইয়া দিয়া সুজা অর্ধশয়ান হইলেন, গালের চিহ্নটার উপর অঙ্গুলি বুলাইতে বুলাইতে নূতন বাঁদী পরীবানুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চোখে কুটিল আনন্দ নৃত্য করিতে লাগিল।

* * * * *

পরীবানু সামান্যা নারী, খ্‌াজা নজর বোথারী সাধারণ মানুষ, মোবারক হতভাগ্য স্বল্পায়ু যুবক ; তাহাদের জীবন-মৃত্যু নিগ্রহ-নিপীড়ন হাসি-অশ্রুর মূল্য কতটুকু ? কেহ কি তাহা মনে করিয়া রাখে ?

হে অতীত, তুমি মনে করিয়া রাখিয়াছ। যাহাদের কথা সকলে ভুলিয়াছে তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই, তোমার ভাণ্ডারে মানুষের সব কথা সঞ্চিত হইয়া আছে। তাই বুঝি বর্ত্তমানের ললাটে তোমার অভিশাপের ভস্মটীকা দেখিতে পাইতেছি।

বালখিল্য

ক্ষুদিরাম বাবুর শৈশবকালে যিনি তাঁহার নামকরণ করিয়াছিলেন, তিনি ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ ছিলেন এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। কিন্তু ক্ষুদিরাম বাবুর পঞ্চাশ বছর বয়সে তাঁহার জীবনে এমন একটি ঘটনা ঘটিল যাহার পর নামমাহাত্ম্য সম্বন্ধে নূতন করিয়া গবেষণা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। শেক্স্‌পীয়র বলিয়াছেন বটে—'নামে কিবা করে? গোলাপ, যে নামে ডাকো, সৌরভ বিতরে।' কিন্তু মহাকবির আপ্তবাক্য আর সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না।

ক্ষুদিরাম বাবুর সহিত আমার অনেক দিনের ঘনিষ্ঠতা। বয়সে আমি প্রায় পনেরো বছরের কনিষ্ঠ, তবু আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বই ছিল বলিতে হইবে। কলিকাতার ভিন্ন পাড়ায় বাস করিলেও প্রায়ই তাঁহার বাড়ীতে যাতায়াত করিতাম। তাঁহার দাম্পত্য জীবন সুখের ছিল না। গৃহিণীটি কিছু অধিক মাত্রায় প্রখরা, ক্ষুদিরাম বাবুও একগুঁয়ে লোক; দু'জনের মধ্যে প্রায়ই খিটিমিটি লাগিয়া থাকিত, কদাচিৎ ঝগড়ার ঝড় বাদলে ফাটিয়া পড়িত। সন্তানাদি না থাকায় তাঁহাদের প্রকৃতিগত দূরত্বের মাঝখানে সেতুবন্ধন রচিত হয় নাই।

শহরের দক্ষিণ অংশে একটি ছোটখাট দ্বিতল বাড়ীতে এই প্রৌঢ়-দম্পতি বাস করিতেন। সংসারের যাবতীয় কাজ গৃহিণী করিতেন, ক্ষুদিরাম বাবু কেবল তাঁহার লাইব্রেরী ঘরে বসিয়া বই পড়িতেন এবং অদ্ভুত যন্ত্রপাতি ও মালমশলা লইয়া বিষবৈদ্যের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহাদের অর্থের অভাব ছিল না, বাড়ীটিও নিজস্ব।

ক্ষুদিরাম বাবু যে পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্যের কোনও ছিরিছাঁদ ছিল না। আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত হঠযোগ ও তন্ত্রমন্ত্র মিশাইয়া তিনি তাঁহার মস্তিষ্কের মধ্যে এমন এক প্রকার খিচুড়ি তৈয়ার করিয়াছিলেন যাহা সাধারণ মানুষের পক্ষে একেবারেই দুষ্পাচ্য। অনেকে মনে করিত তাঁহার মাথায় ছিট আছে। অনুমানটা মিথ্যা না হইতেও পারে; কারণ এ সংসারে কাহার মাথায় ছিট আছে এবং কাহার মাথায নাই তাহা নির্ণয় করিবার মত প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি পৃথিবীতে বিরল। তবে ক্ষুদিরাম বাবুর কথাবার্তা চালচলন সাধারণ মানুষের মত ছিল না তাহা স্বীকার করিতে হইবে। তিনি প্রায় সকল সময় গেরুয়া রঙে রঞ্জিত কোট-প্যাণ্টুলুন পরিয়া থাকিতেন; আমি একদিন প্রশ্ন করায় তিনি প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া আমাকে বক্তৃতা শুনাইয়াছিলেন। সব যুক্তি তর্ক এখন মনে নাই, এইটুকু শুধু স্মরণ আছে যে গেরুয়া কোট প্যাণ্টুলুন পরিলে শরীরে বৈদ্যুতিক শক্তি বৃদ্ধি পায়।

ক্ষুদিরাম বাবুর এত পরিচয় দিবার কারণ, এই কাহিনীটি তাঁহারই জীবনের শেষ অধ্যায়ের ইতিহাস। তিনি আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ছিলেন, কয়েকটি কারণে আমি তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম; সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে কোনও অতিরঞ্জিত উদ্ভট কাহিনীর অবতারণা করিতেছি এরূপ কেহ যেন মনে না করেন।

শরীরটা কিছুদিন ভাল যাইতেছিল না, তাই ক্ষুদিরাম বাবুর বাড়ী যাইতে পারি নাই। হঠাৎ একদিন খবর পাইলাম, তিনি নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। খুবই আশ্চর্য হইলাম; ক্ষুদিরাম বাবু তো সাধু সন্ন্যাসী

হইবার লোক নয়। তবে কিছুই বলা যায় না; গৃহিণীর সহিত অন্তর্যুদ্ধ হয়তো ভিতরে ভিতরে চরমে উঠিয়াছিল। গৃহিণীর সহিত যেখানে মনের মিল নাই, সেখানে গৃহ ও অরণ্যে তফাৎ কোথায়?

অসুস্থ শরীর লইয়াই অপরাহ্ণে বালিগঞ্জে গেলাম। দেখিলাম, সংবাদ মিথ্যা নয়। ক্ষুদি-গিন্নী অনেক বিলাপ করিলেন। বয়স চল্লিশের নিকটবর্তী হইলেও তাঁহার চালচলন একটু নবীনধর্মী। তাঁহার বিলাপের ভিতর দিয়া এই ইঙ্গিতটাই স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল যে, পত্নীকে লোক-সমাজে অপদস্থ করিবার জন্যই ক্ষুদিরাম বাবু এমন রহস্যময় ভাবে অন্তর্ধান করিয়াছেন।

বস্তুত ক্ষুদিরাম বাবুর অন্তর্ধানকে ঘোরতর রহস্যময় বলা যাইতে পারে। গত রাত্রে আহারাদির পর তিনি তাঁহার লাইব্রেরী কক্ষে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। দুইদিন যাবৎ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ ছিল, সুতরাং স্ত্রী রাত্রে স্বামীর কোনও খোঁজ খবর লন নাই। আজ সকালে উঠিয়া তিনি দেখিলেন, ক্ষুদিরাম বাবু রাত্রে শয়ন করিতে আসেন নাই, লাইব্রেবী ঘরের দ্বার পূর্ববৎ বন্ধ আছে। ক্ষুদি-গিন্নী উদ্বিগ্ন হইয়া দরজায় ধাক্কা দিয়াছিলেন; দরজার ছিটকিনি কিছু আল্‌গা ছিল, কিছুক্ষণ ঠেলাঠেলির পর খুলিয়া গেল। তখন ক্ষুদি-গিন্নী ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, স্বামী নাই। তাঁহার গেরুয়া কোট প্যাণ্টুলুন চেয়ারের উপর পড়িয়া আছে কিন্তু তিনি অন্তর্হিত হইয়াছেন। দ্বিতলের এই ঘর হইতে বাহির হইবার অন্য কোনও পথ নাই; অবশ্য গরাদহীন একটা জানালা আছে, সেই পথ দিয়া অবতরণ করা কঠিন হইলেও একেবারে অসম্ভব নয়। ক্ষুদি-গিন্নী যথারীতি চেঁচামেচি করিয়া-ছিলেন কিন্তু স্বামীর সন্ধান পান নাই। শুধু তাই নয়, ক্ষুদিরাম বাবুর

সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর পোষা বেরালটাও অদৃশ্য হইয়াছিল, তাহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছিল না।

একি অসম্ভব ব্যাপার! ক্ষুদিরাম বাবুর প্রাণে যদি বৈরাগ্যই জাগিয়াছিল তবে তিনি সম্পূর্ণ দিগম্বর বেশে কেবল একটি বিড়ালকে সঙ্গী লইয়া বিবাগী হইলেন কেন? ইহা তো সহজ মানুষের কাজ নয়। তবে কি কোনও কারণে তাঁহার মস্তিষ্ক বিকার ঘটিয়াছে?

ক্ষুদি-গিন্নী আমাকে লাইব্রেরী ঘরে লইয়া গেলেন। ঘরটি বেশ বড়, দেয়াল ঘিরিয়া বইয়ের আলমারি। মাঝখানে একটি দেরাজ-যুক্ত টেবিল, তাহার উপর বিবিধ আকৃতির বোতল খল্ নুড়ি প্রভৃতি অগোছালো ভাবে ছড়ানো রহিয়াছে। এই ঘরে বসিয়া ক্ষুদিরাম বাবুর কত আজগুবি গবেষণা শুনিয়াছি। দেখিলাম, তাঁহার চেয়ারের উপর গেরুয়া কোট প্যাণ্টুলুন পড়িয়া আছে; এমন কি আভ্যন্তরিক অঙ্গবাসও তিনি ফেলিয়া গিয়াছেন। ক্ষুদি-গিন্নী সখেদে টেবিল ও আলমারিগুলি দেখাইয়া বলিলেন,—'এসব আর কিসের জন্যে ঠাকুরপো? তুমি তো অনেক জানো শোনো, এসব বিক্রি করে ফেলা যায় না?'

আশ্চর্য হইয়া বলিলাম,—'বলেন কি বৌদি? ক্ষুদিরামদা হয়তো কালই ফিরে আসবেন। যে-বেশে তিনি বেরিয়েছেন পুলিশের হাতে পড়াও অসম্ভব নয়। তাঁর এত আদরের জিনিষপত্র বিক্রি করে ফেলতে চান?'

ক্ষুদি-গিন্নী আর কিছু বলিলেন না। স্বামীর প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা উপলব্ধি করিয়া তিনি প্রসন্ন হইলেন কিনা বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম,—'ক্ষুদিরামদা চিঠিপত্র কিছু রেখে গেছেন কিনা খুঁজে দেখেছেন?'

'তুমিই খুঁজে ছাখো ভাই, আমি তো কিছু পাই নি।' বলিয়া তিনি ঘর হইতে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর টেবিল দেরাজ সবই হাঁটকাইয়া দেখিলাম, কিন্তু চিঠিপত্র কিছু পাওয়া গেল না; ক্ষুদিরামদা কোনও কৈফিয়ৎ না দিয়া নিঃসাড়ে সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। বিক্ষিপ্ত চিত্তে ঘরের এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, ক্ষুদিরামদা কিরূপ মনোভাব লইয়া গৃহত্যাগী হইয়াছেন অনুমান করিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু চেষ্টা বিফল হইল। কোনও অবস্থাতেই তাঁহার নাগা সন্ন্যাসী হওয়া কল্পনা করিতে পারিলাম না।

একটি আলমারির কবাট দুই ইঞ্চি ফাঁক হইয়া ছিল। মনে হইল কাল রাত্রে হয়তো এই আলমারি হইতে বই লইয়া ক্ষুদিরামদা পড়িয়াছিলেন। সংসার হইতে বিদায় লইবার প্রাক্কালে কিরূপ বই পড়িবার ইচ্ছা তাঁহার হইয়াছিল, জানিবার ঔৎসুক্য হইল। কাছে গিয়া কাঁচের ভিতর দিয়া দেখিলাম প্রেততত্ত্ব ঘটিত নানা জাতীয় পুস্তক। ইংরেজী বই আছে, বাংলা আছে।

'ওহে বিকাশ—!'

চমকিয়া উঠিলাম—কে ডাকিল? কণ্ঠস্বর চেনা চেনা, কিন্তু এত ক্ষীণ ও সূক্ষ্ম যে বিশ্বাস হয়না। রেডিও খুলিয়া দিবার পর প্রথমে যেরূপ বহু দূরাগত অস্ফুট আওয়াজ শোনা যায় এ যেন অনেকটা সেই রকম। কিন্তু কে আমাকে ডাকিল? ঘরের চারিদিকে সচকিত দৃষ্টিপাত করিলাম, কৈ কেহই তো নাই।

'ওহে বিকাশ—'

এবার চিনিতে পারিলাম—ক্ষুদিরামদা'র গলা; এবং তাহা আসিতেছে

আলমারির ভিতর হইতে! তবে কি ক্ষুদিরামদা কোনও অভাবনীয় উপায়ে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন?

'শুনছ? আমি এখানে।'

অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে আলমারির দরজা আর একটু খুলিলাম। অমনি নীচের থাকের পুস্তকশ্রেণীর পিছন হইতে তড়াক করিয়া একটি জীব বাহির হইয়া আসিল। আমিও তড়াক করিয়া দুই পা পিছাইয়া আসিলাম। জীবনে এত বিস্মিত কখনও হই নাই।

ভূত-প্রেত নয়—জীবন্ত ক্ষুদিরামদা। সেই টাক মাথা; সেই নিকষ কৃষ্ণ বর্ণ, নাক মুখ চোখ সবই ঠিক তেমনি আছে—কিন্তু তাঁহার দৈহিক দৈর্ঘ্য স্রেফ্ ছয় ইঞ্চি হইয়া গিয়াছে। রুমালের মত একটা ন্যাকড়া কৌপীণের আকারে কোমরে জড়াইয়া তিনি ঊর্দ্ধমুখ হইয়া দৃপ্ত-ভঙ্গীতে আমার পানে তাকাইয়া আছেন।

আকস্মিক ধাক্কায় আমার বুদ্ধিসুদ্ধি প্রায় সবই দিশাহারা হইয়া গিয়াছিল, তবু উবু হইয়া বসিয়া তাঁহাকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলাম। কেমন করিয়া সম্ভব হইল জানিনা কিন্তু ইনি নিঃসংশয়ে ক্ষুদিরামদা'র অতি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। মাথাটি আমড়ার মত এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সেই অনুপাতে। সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা ক্ষুদিরাম'দা কোন ইন্দ্রজাল প্রভাবে এমন একরত্তি হইয়া গেলেন ভাবিয়া পাইলাম না।

আলো চালের মত দাঁত বাহির করিয়া ক্ষুদিরামদা হাসিলেন, তাঁহার সূক্ষ্ম অথচ স্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম,—'চিনতে পেরেছ তাহলে? ভয় পেও না। আগে ঘরের দরজা চট্ করে বন্ধ করে দাও। নইলে, গিন্নী দেখতে পেলেই সর্বনাশ।'

তাড়াতাড়ি গিয়া দরজার ছিট্‌কিনি লাগাইলাম। ফিরিয়া আসিয়া

দেখি ক্ষুদিরামদা কার্পেটের উপর পদ্মাসনে বসিয়াছেন; কৌপীন পরিহিত বেশে তাঁহাকে বালখিল্য মুনির মত দেখাইতেছে। আমিও তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট হইলাম।

তিনি বলিলেন,—'বড়ই বিপদে পড়েছি হে বিকাশ—'

বলিলাম,—'তাহলে সত্যিই আপনি ক্ষুদিরামদা?'

তিনি চোখ পাকাইয়া তাকাইলেন। তাঁহার মেজাজ স্বভাবতই একটু তিরিক্ষি, তাই তাড়াতাড়ি বলিলাম,—'না না, বুঝেছি আপনি ক্ষুদিরামদা। কিন্তু আপনার এ অবস্থা হল কি করে?'

তিনি বলিলেন,—'সে কথা পরে বলছি। ক্ষিদেয় নাড়ী জ্বলে যাচ্ছে, আগে খাবার ব্যবস্থা কর।'

'খাবার ব্যবস্থা! কিন্তু বৌদির কাছে খাবার চাইতে গেলে—'

'না না, ওদিকে যেও না। ঐ আলমারির মাথায় বিস্কুটের টিন আছে নামিয়ে নিয়ে এস।'

বিস্কুটের টিন নামাইয়া কয়েকটি বিস্কুট ক্ষুদিরামদা'কে দিলাম; তিনি একটি বিস্কুট দুই হাতে ধরিয়া কুটুর কুটুর করিয়া খাইতে লাগিলেন।

বলিলাম,—'এবার বলুন কী করে এই অদ্ভুত পান্তর হল।'

তিনি তখন বিস্কুট খাইতে খাইতে বলিতে আরম্ভ করিলেন, আমি তাঁহার দিকে যতদূর সম্ভব ঝুঁকিয়া শুনিতে লাগিলাম—

'আর বল কেন? বগুলা বাবার নাম শুনেছ তো? ব্যারাকপুরে এসে আছেন। কিছু দিন থেকে তাঁর কাছে যাতায়াত করছিলুম।

বগলানন্দ বাবাজীর নাম অনেকেই জানেন, তিনি একজন উগ্র প্রকৃতির তান্ত্রিক সাধু। বেশীর ভাগ সময় পাহাড় পর্বতে থাকেন; মাঝে মাঝে কলিকাতার উপকণ্ঠে যখন দেখা দেন তখন তাঁহার কাছে

লোক ভাঙিয়া পড়ে। বাবাজী নাকি সিদ্ধপুরুষ, অনেক অলৌকিক ক্ষমতা আছে।

ক্ষুদিরামদা বলিয়া চলিলেন,—‘বাবা অষ্টসিদ্ধি লাভ করেছেন। অষ্ট-সিদ্ধি জানো তো? অনিমা লঘিমা—এই সব। ভাবলুম, দেখি তো সত্যিই অষ্টসিদ্ধি বলে কিছু আছে কিনা। জোঁকের মতন বাবার পেছনে লেগে গেলুম। বাবা প্রথমে কিছুতেই আমল দিতে চান না, কয়েকবার গালাগালি দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন। শেষে কাল সকালবেলা নাছোড়বান্দা হয়ে বাবাকে ধরলুম। বললুম বাবা, আজকাল পৃথিবীর লোক কিছু বিশ্বাস করেনা, বিজ্ঞান এসে মানুষের মাথা বিগড়ে দিয়েছে। এখন আপনি যদি অষ্টসিদ্ধি প্রমাণ করে দিতে পারেন তাহলে বিজ্ঞানের মুখে চুণকালি পড়বে, মানুষের ধর্ম্মজ্ঞান ফিরে আসবে। শুনে বাবা বললেন, ঐসা বাৎ? আচ্ছা লেঃ! এই বলে ঝুলির ভেতর থেকে একটি পুরিয়া বার করে দিলেন। বললেন, এই পুরিয়ার মধ্যে মন্ত্রপূত গুঁড়ো আছে, মধু দিয়ে মেড়ে আজ রাত্রে খাবি। জিজ্ঞেস করলুম, এতে কী হবে বাবা? বাবা হেসে বললেন, এখন বলব না; খেয়ে ত্যাখ্, বুঝতে পারবি।

পুরিয়া নিয়ে ফিরে এলুম। মনে কেমন ধোঁকা লাগল। সাধু সন্নিসির মন বোঝা ভার, কি জানি বাবা যদি আমার হাত ছাড়াবার মৎলবে বিষ-টিষ কিছু দিয়ে থাকেন? কিন্তু এদিকে পরীক্ষা না করলেও নয়। একবার ভাবলুম গিন্নীর ওপর পরখ করে দেখি—যায় শত্রু পরে পরে। কিন্তু তাঁকে খাওয়াব কি করে? বিশেষত এখন ঝগড়া চলছে। শেষে ভেবে চিন্তে ঠিক করলুম আমিই খাব, তবে সবটা খাবনা; একটুখানি খেয়ে দেখব কোনও ফল হয় কিনা। ভাগ্যিস একটুখানি খেয়েছিলুম,

নইলে, একেবারে 'ভাইরাস্' হয়ে যেতুম, মাইক্রসকোপ দিয়েও আমাকে দেখতে পেতে না।

'যাহোক, কাল রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর এই ঘরে দোর বন্ধ করে বসলুম। পুরিয়া খুলে দেখি, হলদে রঙের একটুখানি গুঁড়ো। খল নুড়ি মধু যোগাড় করে রেখেছিলুম, গুঁড়ো খলে দিয়ে বেশ ভাল করে মধু দিয়ে মাড়লুম। মুখরোচক একটি সুগন্ধ বেরুতে লাগল।

'মাড়া শেষ হলে নুড়ির মাথায় যতটুকু ওঠে ততটুকু ওষুধ বেটে নিলুম। তারপর খল নুড়ি সরিয়ে রেখে চেয়ারে বসলুম।

'দু' মিনিট যেতে না যেতেই বুঝলুম। ওষুধ ধরেছে। শরীরের ভেতর থেকে একটা ঝাঁঝ বেরুচ্ছে। জ্বালা নয়—তাপ। মনে হল আমার শরীরের যতকিছু পদার্থ সব আগুনের তাপে বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে। ক্রমে তাপ অসহ্য হয়ে উঠল, আমি অজ্ঞান হয়ে গেলুম—

'যখন জ্ঞান হল রাত তখন দুটো। দেখি, চেয়ারের ওপর পড়ে আছি, চেয়ারটা মস্ত বড় দেখাচ্ছে। প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারলুম না, আমার কাপড় চোপড় এত বড় হয়ে গেছে কী করে? তারপর বুঝলুম, আমিই ছোট হয়ে গেছি। কোটের পকেট থেকে অনেক কষ্টে রুমাল বার করে পরে ফেললুম। লজ্জা নিবারণ করতে হবে তো!'

এতক্ষণে ক্ষুদিরামদা'র অর্ধেক বিস্কুট খাওয়া হইয়াছে, তিনি পেটে হাত বুলাইয়া একটি উদ্গার তুলিলেন, বলিলেন,—'একটু জল পেলে ভাল হত—কিন্তু জল আর কোথায় পাবে? মধু'র বোতলটা নিয়ে এস।'

মধু'র বোতল টেবিলের উপর ছিল, আনিয়া দিলাম। ক্ষুদিরামদা দুই ফোঁটা মধু পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন।

বলিলাম,—'তারপর?'

তিনি কহিলেন,—'তারপর অনেক কায়দা করে চেয়ার থেকে নামলুম। কিন্তু দরজা খুলব কি করে, ছিট্‌কিনি তো নাগাল পাব না! ঘরময় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে ভাবতে লাগলুম, এখন কী করি? ওষুধ খেয়ে যে এই অবস্থা হবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। গিন্নী যদি জানতে পারেন আমি এতটুকু হয়ে গেছি, তাঁর আনন্দের সীমা থাকবে না, বলবেন তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করার ফলেই আমার এই দশা হয়েছে। তার ওপর তাঁর যে রকম বিষয়-বুদ্ধি, হয়তো আমাকে সার্কাসে দেখিয়ে টাকা রোজগারের ফন্দি বার করবেন। সুতরাং আর যাই করি গিন্নীকে জানতে দেওয়া হবে না। তোমার ওপর আমার আদেশ রইল একথা কাউকে বলবে না।' বলিয়া কট্‌মট্‌ করিয়া আমার পানে তাকাইলেন।

দেখিলাম, তাঁহার আকৃতি ছোট হইয়া গেলেও প্রকৃতি আগের মতই আছে। এতটুকু মানুষের আজ্ঞা পালন করিতে হইবে, ইহাতে মনটা খুঁৎখুঁৎ করিতে লাগিল। কিন্তু তবু অমান্য করিবার উপায় নাই, তিনি গুরুজন। আপাততঃ আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইয়া প্রশ্ন করিলাম,—'রাত্রে আর কিছু ঘটেনি?'

তিনি চক্ষু ঘুরাইয়া বলিলেন,—'ঘটেনি আবার? ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ এক সময় দেখি, জানলা দিয়ে একটা প্রকাণ্ড বাঘ ঘরে ঢুকছে। তারপরই বুঝতে পারলুম, বাঘ নয়, গিন্নীর পোষা বেরালটা; কার্নিশ দিয়ে এসে জানলা খোলা পেয়ে ঘরে ঢুকেছে।

'বেরালটা আমাকে দেখতে পেয়ে কিছুক্ষণ ল্যাজ ফুলিয়ে চেয়ে রইল, তারপর দাঁত খিঁচিয়ে আমাকে ধরতে এল। আমার অবস্থা বুঝতে পারছ, বেরালের হাতেই বুঝি প্রাণটা যায়। ঘরময় ঘোড়দৌড় করে বেড়ালুম,

পেছনে বেরাল। ধরে আর কি। ভাগ্যে এই সময় চোখে পড়ল আলমারির দরজা একটু ফাঁক হয়ে আছে, সুট্ করে ঢুকে পড়লুম। আলমারির দরজা এত কম ফাঁক ছিল যে বেরালটা ঢুকতে পারল না।

'যাক, এ দফা প্রাণটা তো বাঁচল। আলমারির মধ্যে বইয়ের মাথায় বসে কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখতে লাগলুম, বেরালটা গর্‌ গর্‌ করতে করতে সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারপর যখন দেখলে আমাকে ধরবার কোনও আশা নেই তখন গিয়ে টেবিলের ওপর উঠল। খলের মধ্যে বাকি ওষুধ-টুকু ছিল, দেখি তাই চেটে চেটে খাচ্ছে।

'তারপর পাঁচ মিনিটও কাটল না, দেখতে দেখতে বেরালটা ছোট হয়ে বেবাক অদৃশ্য হয়ে গেল, ফোলানো রবারের বেলুন হাওয়া বেরিয়ে গেলে যেমন কুঁচ্‌কে যায় ঠিক সেই রকম। সে হয়তো এখনও এই ঘরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু এত ছোট যে চোখে দেখতে পাবে না।'

কাহিনী শেষ করিয়া ক্ষুদিরামদা বলিলেন,—'একে বলে অষ্টসিদ্ধি। অষ্টসিদ্ধির প্রথম কিস্তি হচ্ছে অণিমা—অর্থাৎ অণুর মত ছোট হতে পারা। বগুলাবাবা ঠক জোচ্চোর নয়, আসল সিদ্ধপুরুষ। হাতে হাতে প্রমাণ করে দিয়েছেন।'

আমি আবেগভরে বলিলাম,—'এই অদ্ভুত ব্যাপার যখন জগতে প্রচার হবে তখন পাশ্চাত্যের জড়বাদীরা বুঝবে, ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে কী জিনিষ আছে—'

ক্ষুদিরামদা অধীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—'ও সব পরের কথা। এখন আমাকে আবার স্বাভাবিক চেহারায় ফিরে যেতে হবে—'

বলিলাম,—'কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে? প্রত্যক্ষ প্রমাণ না দেখাতে পারলে পশ্চিমের নাস্তিকেরা—'

'উচ্ছন্নে যাক পশ্চিমের নাস্তিকেরা। তাদের জন্যে আমি ছ'ইঞ্চির মানুষ হয়ে জন্ম কাটাতে পারব না।'

'তবে কি করবেন ?'

'শোনো, তোমাকেই এ কাজ করতে হবে। এখনি তুমি ব্যারাকপুরে বগুলাবাবার কাছে যাও; তাঁকে আমার সব কথা বলে তাঁর কাছ থেকে কাটান্-ওষুধ নিয়ে আসবে। বাবা একটু তেরিয়া মেজাজের লোক, কিন্তু তাঁর দাঁত খিঁচুনিতে ভয় পেয়োনা। লেগে থাকলেই বাবা প্রসন্ন হবেন। বুঝলে ? এখনি বেরিয়ে পড়—'

এই সময় দ্বারে করাঘাত হইল। ক্ষুদিরামদা কথা শেষ করিলেন না, বিদ্যুৎ বেগে গিয়া আলমারির মধ্যে লুকাইলেন। আমি গিয়া দরজা খুলিয়া দিলাম।

বাহিরে ক্ষুদি-গিন্নী দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার চোখে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। ঘরে প্রবেশ করিয়াই তিনি বলিলেন,—'দোর বন্ধ করে কি হচ্ছিল ?' সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল বিস্কুটের বাক্স ও মধুর বোতলের উপর। তিনি বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া বলিলেন,—'একি ঠাকুরপো, তুমি বিস্কুট খাচ্ছিলে! ক্ষিদে পেয়েছিল আমাকে বললেই হত, আমি জলখাবার আনিয়ে দিতুম।'

লজ্জায় মাথা কাটা গেল। কিন্তু উপায় কি ? ক্ষুদিরামদা'কে শত্রু-হস্তে ধরাইয়া দিতে পারিলাম না, চুরি করিয়া খাওয়ার দায় ঘাড়ে লইয়া লজ্জিত মুখে বলিতে হইল,—'না না বৌদি, আপনাকে এই অবস্থায় মিছে কষ্ট দেব না, তাই—। আচ্ছা, আজ আমি চলি, কাল সকালে আবার আসব। ক্ষুদিরামদা'র চিঠিপত্র কিছু পেলুম না, কাল আবার আলমারি-গুলো ভাল করে খুঁজে দেখতে হবে। আপনি কিছু ভাববেন না, ইয়ে—ক্ষুদিরামদা নিশ্চয় ফিরে আসবেন।'

নীরস কণ্ঠে ক্ষুদি-গিন্নী বলিলেন,—'তাই বল ভাই।'

সেখান হইতে বাহির হইয়া সটান ব্যারাকপুরে গেলাম। পৌঁছিতে রাত্রি হইয়া গেল। খোঁজ খবর লইয়া জানিলাম, বগুলাবাবা আজ সকালেই হরিদ্বার যাত্রা করিয়াছেন।

খুব যে দুঃখিত হইলাম তা নয়। আশু বড় হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া ক্ষুদিরামদা হয়তো সাধারণে আত্মপ্রকাশ করিতে রাজি হইতে পারেন। পরদিন সকালবেলা ক্ষুদিরামদা'র জন্য কাগজে মুড়িয়া একটি সন্দেশ এবং হোমিওপ্যাথিক শিশিতে এক শিশি জল পকেটে লইয়া তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম।

ক্ষুদি-গিন্নীর চেহারা দেখিয়া কিন্তু আশ্চর্য হইয়া গেলাম। কাল কান্নাকাটি সত্ত্বেও চেহারার এমন কিছু অবনতি লক্ষ্য করি নাই; আজ দেখিলাম তাঁহার চোখের কোলে কালি, মুখে একটা শঙ্কিত সচকিত ভাব। জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কী হয়েছে বৌদি?'

তিনি শুষ্কমুখে বলিলেন,—'কী জানি ভাই, কাল রাত্তির থেকে কেবলই ভয় পাচ্ছি। এ বাড়ীর বোধ হয় কোনও দোষ হয়েছে।

'সে কি; ভূত-প্রেত কিছু দেখেছেন নাকি?'

'না, দেখিনি কিছু—কিন্তু—' তিনি ঢোক গিলিয়া অন্য কথা পাড়িলেন,—'আমার আর এ বাড়ীতে মন টিকছে না, ঠাকুরপো। ভাবছি কিছুদিনের জন্যে রাণাঘাটে দিদির কাছে গিয়ে থাকি—'

প্রস্তাবটা মন্দ লাগিল না। বলিলাম,—'বেশ তো। এ বাড়ীতে কাকে রেখে যাবেন?'

'ভাবছি বাড়ীতে তালা দিয়ে যাব।'

এ আবার এক নূতন হাঙ্গামা। ক্ষুদিরামদা কি বাড়ীতে বন্ধ থাকিয়া

শেষে অনাহারে মারা পড়িবেন? জিজ্ঞাসা করিলাম,—'তা কবে যাচ্ছেন?'

'আজ বিকেল সাড়ে তিনটের গাড়ীতে।'

সুতরাং একটা বিলিব্যবস্থা করিতে হইবে। তাঁহাকে বলিলাম,—'তাহলে আপনি বাঁধা-ছাঁদা করুন গিয়ে, আমি আর একবার লাইব্রেরীটা দেখে নিই।'

এই সময় ক্ষুদি-গিন্নীর কয়েকটি সহানুভূতিশীলা বান্ধবী আসিয়া পড়িলেন। ভালই হইল, তিনি বান্ধবীদের লইয়া ব্যস্ত থাকিবেন, আমার কার্যকলাপের উপর নজর রাখিতে পারিবেন না। আমি লাইব্রেরীতে ঢুকিয়া দ্বার বন্ধ করিলাম।

ক্ষুদিরামদা আলমারি হইতে বাহির হইলেন, তাঁহাকে সন্দেশ ও জল খাইতে দিলাম। বগুলাবাবা চলিয়া গিয়াছেন শুনিয়া তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন। তারপর যখন শুনিলেন যে আজই অপরাহ্নে গৃহিণী বাড়ীতে তালা লাগাইয়া রওনা দিতেছেন তখন তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিলেন।

বলিলেন,—'দেখছ কী সাংঘাতিক মেয়েমানুষ।'

আমি বলিলাম,—'তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। হাজার হোক মেয়েমানুষ, একলা বাড়ীতে থাকতে ভয় করছে।'

ক্ষুদিরামদা'র মুখে একটি বাঁকা হাসি দেখা দিল,—'ভয় তো করবেই, আমি ভয় দেখিয়েছি।'

'অ্যাঁ—সে কি?'

অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত তিনি বলিলেন,—'হুঁ। কাল রাত্তিরে দরজা খোলা ছিল, শোবার ঘরে ঢুকেছিলুম। গিন্নী ভারি আরামে ঘুমোচ্ছিলেন—হুঁ হুঁ—তাঁর চুল ধরে টেনেছি, পায়ে সুড়সুড়ি দিয়েছি, আলো নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারে খিক্ খিক্ করে হেসেছি। গিন্নীর অবস্থা যদি দেখতে—'

বলিয়া তিনি তুই হাতে পেট চাপিয়া খিক্ খিক্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম,—'ছি ক্ষুদিরামদা, এ আপনার উচিত হয় নি। অবলা ভদ্রমহিলা—তাঁকে ভূতের ভয় দেখানো—'

তিনি বিদ্রোহীর মত ঘাড় বাঁকাইয়া বলিলেন,—'কেন ভয় দেখাব না? সারা জীবন জ্বালিয়েছে আমাকে। কিন্তু সে যাক, এখন আমার উপায় কি হবে বল।'

পরামর্শ করিয়া উপায় স্থির হইল। আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে তাঁহার গৃহিণীকে সব কথা বলিয়া তাহাকেও দলে লওয়া হোক, কিন্তু ক্ষুদিরামদা সতেজে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কবিলেন। ছয় ইঞ্চির শরীর লইয়া কিছুতেই তিনি গৃহিণীকে দেখা দিবেন না। অগত্যা স্থির হইল, আমি তাঁহাকে লইয়া গিয়া নিজের কাছে রাখিব। আমি একলা মানুষ, আমার বাসায় থাকলে সহজে ধরা পড়িবার ভয় নাই।

পাঞ্জাবীর পকেটে ক্ষুদিরামদাকে পুরিযা চাদরটা ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া লইলাম। তারপর দূর হইতে বৌদির নিকট বিদায় লইলাম। তাঁহার বেশী কাছে যাইতে সাহস হইল না; তিনি যেরূপ সন্দিগ্ধ প্রকৃতির লোক, লাইব্রেরী হইতে কোনও মূল্যবান বস্তু চুরি করিয়া লইয়া পলাইতেছি মনে করিয়া খানাতল্লাসী আরম্ভ করিলেই বিপদ। যাহোক, তিনি বান্ধবীদের লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, কোনও বিভ্রাট ঘটিল না।

ক্ষুদিরামদা আমার বাসায় আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন। অতঃপর তাঁহার কাহিনী যথাসম্ভব সংক্ষেপে শেষ করিব। ইহা যদি কাল্পনিক কাহিনী হইত তাহা হইলে বেশ একটা জোরালো উপসংহার উদ্ভাবন

করিয়া পাঠককে চমৎকৃত করিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু সত্য ঘটনা climaxএর ধার ধারে না, বরং anticlimaxএর দিকেই তার ঝোঁক বেশী। ক্ষুদিরামদা'র কাহিনীর পরিসমাপ্তি পড়িয়া কেহ যদি নিরাশ হন আমার দায়-দোষ নাই, আমি নিছক সত্য কথা লিপিবদ্ধ করিয়া খালাস।

আমার বাসায় আমার শয়ন ঘরে একটি ঝাঁপির মধ্যে তুলা বিছাইয়া ক্ষুদিরামদা'র বাসস্থান নির্দেশ করিলাম। নরম বিছানা পাইয়া প্রথমেই তিনি খুব খানিকটা ঘুমাইয়া লইলেন।

তারপর তাঁহার নানাবিধ ফরমাস আরম্ভ হইল। বুরুষ দিয়া দাঁত মাজিবেন, দাড়ি কামাইবেন, রুমাল পরিয়া আর থাকিবেন না, ইত্যাদি। গেরুয়া কোট প্যাণ্টুলন যদি একান্তই সম্ভব না হয়, অন্ততঃ ধুতি এবং পাঞ্জাবী তাঁহার চাইই। ধুতি সহজেই ন্যাকড়া ছিঁড়িয়া তৈয়ার হইল, কিন্তু পাঞ্জাবী লইয়া বিশেষ বেগ পাইতে হইল। অবশেষে পুতুলের জামা তৈয়ার করাইতেছি এই ছল করিয়া এক দর্জিকে দিয়া পাঞ্জাবী তৈয়ার করাইয়া লইলাম। ধুতি পাঞ্জাবী পরিয়া ক্ষুদিরামদা ভারি খুশী হইলেন। কিন্তু তাঁহার মাপের জুতা কোনও মতেই যোগাড় করা গেল না। বুরুষ দিয়া দাঁত মাজা ও দাড়ি কামাইবার সাধও তাঁহার অপূর্ণ রহিয়া গেল।

সর্বশেষে তিনি বায়না ধরিলেন, হরিদ্বারে গিয়া বগুলাবাবাকে পাকড়াও করিবেন। এ বায়না তাঁহার পক্ষে নেহাৎ অযৌক্তিক নয়। আমার ডাক্তারও কিছুদিন হইতে আমাকে হাওয়া বদল করিবার অনুজ্ঞা জানাইতেছিলেন, সুতরাং এক ঢিলে দুই পাখী মারার উদ্দেশ্যে হরিদ্বার যাওয়াই সাব্যস্ত হইল।

ক্ষুদিরামদা'কে ঝাঁপিতে লইয়া হরিদ্বার রওনা হইলাম। পথে যেসব

বিপদ আপদ ঘটিয়াছিল, ক্ষুদিরামদা ধরা পড়িতে পড়িতে কিরূপে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন, বাহুল্য ভয়ে তাহা আর বর্ণনা করিলাম না।

হরিদ্বারে এক ধর্মশালায় আশ্রয় লইলাম। বগুলাবাবার সন্ধান সহজেই মিলিল, তিনি শহরের বাহিরে এক নির্জন স্থানে বাস করিতেছেন। ঝাঁপি লইয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলাম।

বাবা একাকী ছিলেন। উগ্রমূর্তি রক্তচক্ষু সন্ন্যাসী, আমাকে দেখিয়া কট্‌মট্ করিয়া তাকাইলেন। আমি তাড়াতাড়ি ক্ষুদিরামদা'কে ঝাঁপি হইতে বাহির করিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া দিলাম। বাবা কিছুক্ষণ নিষ্পলক নেত্রে ক্ষুদিরামদা'কে নিরীক্ষণ করিলেন, তারপর তাঁহার জটিল দাড়ি গোঁফ উন্মথিত করিয়া ধমকে ধমকে হাসির লহর বাহির হইতে লাগিল। ক্ষুদিরামদা কাঁচুমাচু মুখ করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বাবার হাসি থামিতেই ক্ষুদিরামদা জোড়হস্তে বলিলেন,—'বাবা, এ আমায় কী করে দিলে!'

বাবা বলিলেন,—'প্রমাণ চেয়েছিলি প্রমাণ পেয়েছিস। এখন দুনিয়ার লোককে দেখা।'

'না বাবা, আমাকে ভাল করে দাও।'

'ছোট হওয়া সহজ, বড় হওয়া অত সহজ নয়।'

'তবে কি চিরকাল এমনি থেকে যাব বাবা?'

'আগের মত হতে তোর দশ বছর লাগবে—যদি বেঁচে থাকিস। একটু একটু করে বাড়বি। যা—আর আমাকে বিরক্ত করিস না।' বলিয়া বাবা আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

চলিয়া আসিলাম। ক্ষুদিরামদা'র মন তো খারাপ হইলই, আমারও

বুক দমিয়া গেল। দশ বছর ধরিয়া ক্ষুদিরামদা'কে বহন করিয়া বেড়াইতে হইবে! দশ বছর না হোক, পাঁচ ছয় বছর তো বটেই। হিসাব করিয়া দেখিলাম, বছরে ক্ষুদিরামদা ছয় ইঞ্চি করিয়া বাড়িবেন। আগামী বছর তাঁর দৈর্ঘ্য হইবে এক ফুট, তার পরের বছর দেড় ফুট। এই ভাবে কত দিন চালাইব? ক্ষুদিরামদা'কে আমি ভক্তি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু বছরের পর বছর তাঁহাকে ঝাঁপিতে লইয়া বহিয়া বেড়াইতেছি কল্পনা করিতেই হাত-পা শিথিল হইয়া গেল। বিধাতা যে অন্তরীক্ষে থাকিয়া আমার আশু মুক্তির উপায় চিন্তা করিতেছেন তাহা তখন জানিতাম না।

বগুলাবাবার আশ্রম হইতে সহর অনেকখানি পথ। মাঝামাঝি আসিয়া ক্লান্ত পদে পথের ধারে একটি পাথরের পাটার উপর বসিলাম। ক্ষুদিরামদা ভিতর হইতে ঝাঁপি আঁচড়াইতে লাগিলেন; স্থান নির্জন দেখিয়া তাঁহাকে খুলিয়া বাহির করিয়া দিলাম।

দৃশ্যটি এখনও আমার চোখের উপর ভাসিতেছে। চারিদিকে উপলবন্ধুর ভূমি, ঊর্ধ্বে উজ্জ্বল নীল আকাশ। পথের ধারে চত্বরের মত একটি শিলাপট্টের উপর আমি বসিয়া আছি, আর একটি ক্ষুদ্র মানবক দুই হাত আস্ফালন করিয়া পাটার উপর পায়চারি করিতেছে।

ক্ষুদিরামদা ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিতেছেন,—'এ রকম হবে জান্‌লে কোন্ শা—। বগুলাবাবা আমার সঙ্গে বজ্জাতি করেছে। নইলে ওষুধ দিয়ে আমাকে ভাল করে দিতে পারত না? নিশ্চয় পারত।'

ক্লান্ত স্বরে বলিলাম,—'আপনি অষ্টসিদ্ধির প্রমাণ চেয়েছিলেন, এখন আর অনুযোগ করা সাজে না। বরং বাবা যা বলেছেন তাই করা উচিত, দুনিয়ার লোককে দেখানো উচিত যে ভারতের সাধনা মিথ্যে নয়। বিলেতের পণ্ডিতেরা—'

মহা ক্ষাপ্পা হইয়া ক্ষুদিরামদা পদদাপ করিলেন. বলিলেন,—'গোল্লায় যাক বিলাতের পণ্ডিতেরা। চিড়িয়াখানার জন্তুর মত আমাকে সবাই দেখবে, গিন্নী মুখে আঁচল দিয়ে হাসবে—সে কিছুতেই হবে না।'

'আমার কথা শুনুন—'

'না না না—কখখনো না।'

হঠাৎ মাথায় রাগ চড়িয়া গেল। বলিলাম,—'আপনি বড় একগুঁয়ে। নিজের ইচ্ছের যদি রাজি না হন আমি জোর করে সকলের সামনে আপনাকে দেখাব। কি করতে পারেন আপনি?'

সেদিন ধৈর্য হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম বলিয়া আজ দুঃখ হয়। ক্ষুদিরামদা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া হাত-পা ছুঁড়িতে লাগিলেন, চক্ষু ঘূর্ণিত করিতে করিতে বলিলেন,—'কী—তোমার এতবড় আস্পর্ধা—'

তাঁহার কথা শেষ হইতে পাইল না। সাঁই করিয়া একটা শব্দ হইল, পরমুহূর্তেই দেখিলাম একটা চিল ক্ষুদিরামদা'কে ছোঁ মারিয়া লইয়া উড়িয়া গেল। চিলের নখের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া ক্ষুদিরামদা চিলের মতই তীক্ষ্ণস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। আমি ক্ষণেক হতভম্ব থাকিয়া চীৎকার করিতে করিতে চিলের পিছনে ছুটিলাম। কিন্তু কোনও ফল হইল না, চিল অবলীলাক্রমে ক্ষুদিরামদা'কে বহন করিয়া দূর আকাশে বিলীন হইয়া গেল।

মৃত্যু কখন কোন দিক দিয়া আসিবে বলা যায় না। একচক্ষু হরিণ অপ্রত্যাশিত দিক হইতে তীর খাইয়াছিল। ক্ষুদিরামদা'র জীবন যে অকস্মাৎ চিলের পেটে গিয়া পরিসমাপ্তি লাভ করিবে তাহা কে কল্পনা করিতে পারিত?

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত চিত্তে হরিদ্বার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। সাধুরা সত্যই বলিযাছেন, সিদ্ধাই ভাল নয়। ক্ষুদিরামদা'র পক্ষে তাহা কল্যাণকর হয নাই। তবু দুঃখ হয়, আমি যাহা দেখিয়াছি তাহা আর কাহাকেও দেখাইতে পারিলাম না।

ক্ষুদি-গিন্নীকে তাঁহার স্বামীর শোচনীয় পরিণামের কথা বলি নাই। তিনি মনে মনে এখনও আশঙ্কা করিতেছেন, হঠাৎ কোনদিন ক্ষুদিরামদা ফিরিযা আসিবেন।

মেয়েমানুষের মনে একটু ভয় থাকা ভাল।

ইন্দ্রতুলক

ইতিহাসের পণ্ডিত বলিলেন,—'গল্প শোনো। কাল রাত্রে প্রাচীন ইতিহাসের এক পুঁথি পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম—'

খুবই স্বাভাবিক। ইতিহাসের পুঁথি পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়ে না এমন মানুষ আমি দেখি নাই।

পণ্ডিত বলিতে লাগিলেন,—'ঘুমিয়ে এক স্বপ্ন দেখলুম। আশ্চর্য স্বপ্ন। আমি যেন ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছি, আর আমার চোখের সামনে যুগের পর যুগ কেটে যাচ্ছে। আট হাজার বছরের পুরানো ইতিহাস চোখের সামনে দেখতে পেলুম।'

জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কাল রাত্রে কি খেয়েছিলেন?'

পণ্ডিত বলিলেন,—'মনে নেই। গিন্নী বলতে পারেন।'

গৃহিণী বলিলেন,—'কাঁকড়ার ঝোল আর ভাত।'

বলিলাম,—'বুঝেছি, ইংরেজিতে যাকে বলে নাইট্‌ মেয়ার আপনি তাই দেখেছেন। আমি এবার উঠি।'

পণ্ডিত বলিলেন,—'আরে বোসো, চা খেয়ে যাও।—ভূগোল পড়েছ?'

বলিলাম,—'ভূগোল? ইতিহাসের স্বপ্ন দেখলেন, তার মধ্যে ভূগোল। ইস্কুলে পড়েছিলুম বটে।'

পণ্ডিত বলিলেন,—'বেশ, এখন একটা দেশ মনে মনে কল্পনা কর, বেলুচিস্থান থেকে ইরাণের দক্ষিণভাগ পর্যন্ত। কল্পনায় দেখতে পাও?'

মনের মধ্যে ম্যাপ আঁকিবার চেষ্টা করিলাম ; পূর্বদিকে সিন্ধু নদ, পশ্চিমে পারস্য উপসাগরের মুখ, দক্ষিণে সমুদ্র, মাঝখানে পাহাড় ও মরুভূমিতে ভরা একটা দেশ।

পণ্ডিত বলিলেন,—'আট হাজার বছর আগে সিন্ধুনদ ছিল না। বর্তমানে যে দেশটা পাঞ্জাব নামে পরিচিত সেটা ছিল ধূ ধূ মরুভূমি। আর কাশ্মীব ছিল প্রকাণ্ড একটা মিঠে জলেব হ্রদ। এখন কল্পনা কর, পূর্বদিকে দুস্তর মরুভূমি, উত্তরে দুর্ভেদ্য পাহাড়, দক্ষিণে সমুদ্র—মাঝখানে সরু এক ফালি দেশ। কোনও দিক দিযেই বেরুবার রাস্তা নেই। আট হাজার বছর আগে এই দেশে একটা জাতি বাস করত।

বর্বর জাতি ; কিন্তু গায়ের চামড়া কটা, চোখের মণি নীল, চুল সোনালি। পরবর্তী কালে যারা আর্য বলে পরিচিত হয়েছিল এরা তারাই। এই দেশই তাদের আদিম বাসভূমি। পাহাড় এবং মরুভূমির পরপারে কালো মেটে পাঁশুটে নানা রঙের মানুষ বাস করত বটে, কিন্তু তাদের সঙ্গে এই আর্যদের মেলামেশার কোনও উপায় ছিল না। সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ-ভাবে এই জাতি বহুকাল বাস করেছিল। নিঃসঙ্গতার মধ্যেই তাদের ভাষা এবং সংস্কৃতি পরিপুষ্ট হয়েছিল।

'শুকনো দেশ, তার ওপর ওরা তখন চাষবাস করতেও জানত না। গরু, ছাগল পুষতে শিখেছিল, কিন্তু ঘোড়া কি জন্তু তা কখনও চোখে দেখেনি। দেশের পূর্ব-সীমায় বেলুচিস্থানের পাহাড়ে একরকম ঘাস জন্মাত, তার বীজ তারা গুঁড়ো করে খেতো। এই পাহাড়ী ঘাসের বীজ আধুনিক গমের পূর্বপুরুষ। কিন্তু তাতে তাদের পেট ভরত না ; এই জাতির প্রধান জীবিকা ছিল সমুদ্রে মাছ ধরা।

'ছোট ছোট নৌকায় চড়ে তারা সমুদ্রের কিনারে কিনারে মাছ ধরে

বেড়াত। মাছ তাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন, তাই মাছকেই তারা দেবতা মনে করত। মৎস্য ছিল তাদের অবতার।

তাদের অবশ্য একজন রাজা ছিল। রাজার নাম মনু। তখনকার বর্বরতার যুগে সকল জাতিরই একটা totem থাকত ; এই জাতির totem ছিল সূর্য। মনু দাবী করতেন সাক্ষাৎ বিবস্বান তাঁর আদি পুরুষ।

'সমুদ্রে পুরুষানুক্রমে মাছ ধরার ফলে এই জাতি নৌ-বিদ্যা বেশ আয়ত্ত করেছিল। মনুর কয়েকটা বড় বড় নৌকা ছিল, তিনি তাইতে চ'ড়ে মাছ ধরে বেড়াতেন। তিনি ভারি বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, সমুদ্রের জল-বাতাস লক্ষ্য করে আসন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বুঝতে পারতেন।

একদিন মনু সমুদ্রে মাছ ধরছেন, তাঁর জালে এক অদ্ভুত চেহারার মাছ উঠল। মাছের নাকের কাছে এক শিং। মনু পঞ্চাশ বছর এই সমুদ্রে মাছ ধরেছেন, কিন্তু এমন মাছ কখনও চোখে দেখেননি। মাছটা ধড়ফড় করল না, নির্জীব হয়ে পড়ে রইল। মনু বুঝলেন, এ মাছ অজানা কোনও সমুদ্র থেকে এসেছে। তিনি আকাশের দিকে তাকালেন, মনে হল আকাশ বাতাস যেন এক মহা দুর্যোগের প্রতীক্ষায় থমথম করছে।

'মনু তাড়াতাড়ি তীরে ফিরে এলেন, প্রজাদের জড়ো করে বললেন,—'আমি জানতে পেরেছি এক মহাপ্লাবন আসছে, পৃথিবী ডুবে যাবে। তোমরা যদি বাঁচতে চাও যে-যার নৌকায় ওঠো।'

'মনুর কথায় অনেকেই নৌকায় গিয়ে উঠল। মনু তাঁর স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-পরিজন গরু ছাগল নিয়ে নিজের বড় বড় নৌকা ভরতি করলেন। যারা মনুর কথা বিশ্বাস করল না কিংবা যাদের নৌকা ছিল না তারা মাটিতেই রইল।

সন্ধ্যাবেলা সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে, সমুদ্র থেকে হুহুঙ্কার শব্দ শোনা গেল। দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে তালগাছের মত উঁচু ঢেউ ছুটে আসছে, তার সঙ্গে ঝড়-তুফান। দেখতে দেখতে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল।

'পরদিন সকালবেলা দেখা গেল চারিদিক জলে জলময়, কোথাও মাটির চিহ্নমাত্র নেই। ছোট নৌকাগুলো ঢেউয়ের ঝাপটে সব ডুবে গেছে, কেবল মনুর কয়েকটা বড় নৌকা প্রলয়পয়োধি জলে বটপত্রের মত ভাসছে।

পণ্ডিতকে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—'এরকম একটা রসাতল কাণ্ড কেন হল আপনি জানতে পেরেছিলেন?' 'পেরেছিলাম। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করতে পারবে?' 'বলুন, চেষ্টা করে দেখি।'

'পারস্য উপসাগর তখন হ্রদ ছিল, সমুদ্রের সঙ্গে যোগ ছিল না। ম্যাপ দেখলে তার কতকটা আন্দাজ পাবে। হ্রদের উত্তর দিকে দুটো বড় বড় নদী—ট্রাইগ্রিস আর য়ুক্রেটিস—ক্রমাগত হ্রদের মধ্যে জল ঢালছিল, হ্রদের জল বেড়ে বেড়ে তীর ছাপিয়ে যেতে লাগল। তারপর একদিন জলের চাপে সমুদ্রেব দিকের বাঁধ ভেঙ্গে গেল, হ্রদ সমুদ্রে মিশল। হু হু শব্দে জল বেরিয়ে সমুদ্র তোলপাড় করে ছুটতে লাগল। সেই তোড়ে আশপাশের তীরভূমি ডুবে গেল। এই হচ্চে মহাপ্লাবনের কারণ। মহাপ্লাবনের যত প্রাচীন গল্প আছে সব ঐ পারস্য উপসাগরকে কেন্দ্র ক'রে। ঘটনাটা ঐখানেই ঘটেছিল কি না।'

আমি গুম্ হইয়া গেলাম। কিন্তু তর্ক করা বৃথা, স্বপ্নের বিরুদ্ধে তর্ক নিষ্ফল। বলিলাম,—'বুঝেছি। তারপর মনুর কথা বলুন।'

পণ্ডিত বলিলেন,—'সাত দিন সাত রাত মনু নৌকায় ভাসতে লাগলেন। রাজ্যের উত্তর সীমানা ঘিরে যে পাহাড় ছিল তার নাম সুমেরু, মনুর নৌকা ঢেউয়ের ধাক্কা খেয়ে সেইদিকে ভেসে চল্‌ল।

'সাত দিন পরে জল নামতে আরম্ভ করল ; বানের জল যেমন জোরে আসে তেমনি জোরে নেমে যায়। মনু তখন সুমেরুর গায়ে গিয়ে ঠেকেছেন, একটা চূড়ায় নৌকা বেঁধে ফেললেন।

'ক্রমে সমুদ্রের জল সমুদ্রে ফিরে গেল, আবার ডাঙ্গা জেগে উঠ্ল। দেশ যেমন ছিল প্রায় তেমনি আছে, কিন্তু মানুষ সব শেষ হয়ে গেছে। বেঁচে আছেন শুধু মনু আর তাঁর জ্ঞাতিগোষ্ঠী। আর কয়েকটি ছাগল গরু।

'মনু তাই নিয়ে আবার নতুন ক'রে জীবন আরম্ভ করলেন যাকে বলে কেঁচে গণ্ডুষ।'

এই সময় চা আসিয়া পড়িল। পণ্ডিত পেয়ালা তুলিয়া লইয়া চুমুক দিলেন।

বলিলাম,—'আপনার স্বপ্ন এইখানেই শেষ তো ?'

পণ্ডিত বলিলেন,—'আরে রামঃ, আরো অনেক আছে। তুমি ব্যস্ত হয়ে পড়েছ, সংক্ষেপে বলছি। মনুর পর আন্দাজ পাঁচশ' বছর কেটে গেল। মনু দেহরক্ষা করলেন, কিন্তু তাঁর বংশধরেরা আবার দলে ভারী হয়ে উঠল।

প্রশ্ন করিলাম,—'পাঁচশ' বছর কেটে গেল বলছেন, তার মানে সাড়ে সাত হাজার বছর আগেকার কথা ?'

পণ্ডিত বলিলেন,—'মোটামুটি। তখন আকাশে ধ্রুবতারা ছিল না। ধ্রুবতারা এসেছিল আরও দু'হাজার বছর পরে। কিন্তু সে অন্য ধ্রুবতারা, জ্যোতিষে তার নাম Alpha Draconis। বেদে তার উল্লেখ আছে। আজকাল যাকে আমরা ধ্রুবতারা বলি সে অন্য তারা।'

'সর্বনাশ ! ধ্রুবতারা আবার কটা আছে ?'

'অনেক। কিন্তু জ্যোতিষের জটিল তত্ত্ব তুমি বুঝবে না, সে যাক। মহাপ্লাবনের পর দেশের আবহাওয়া কিছু বদ্‌লেছিল, মাটির ওপর পলি পড়েছিল। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের দু'একটা রাস্তাও খুলে গিয়েছিল।

'মহাপ্লাবনের পর আর্যদের নতুন দেবতা হলেন—বরুণ। তিনি জলের দেবতা, রাখলে রাখতে পারেন, মারলে মারতে পারেন, সুতরাং তাঁকে তুষ্ট করা আগে দরকার। এই বরুণকে কেন্দ্র ক'রে আর্যদের আদিম দেবতা গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। আর্যদের ভাষা তখন বেশ দানা বেঁধেছে কিন্তু তারা লিখতে জানে না। সবই কানে শোনা কথা—শ্রুতি।

'আর্যরা সংখ্যায় বেশ বেড়ে উঠল। তাদের মধ্যে তুক্‌-তাক্‌ মারণ উচাটন প্রভৃতি দৈবক্রিয়ার উদ্ভব হল; তারা রোজা হয়ে ভূত ঝাড়ে, ওঝা হয়ে সাপের বিষ নামায়। এটা অথর্ব বেদের প্রথম যুগ। অথর্ব বেদ নামেও অথর্ব কাজেও অথর্ব, সবচেয়ে পুরোনো; আর্যদের প্রাচীনতম শ্রুতি ওতে ধরা আছে।

'সে যাক্‌। বাইরে যাবার রাস্তা খোলা পেয়ে দু' চারজন উৎসাহী লোক দেশের বাইরে যেতে আরম্ভ করেছিল। বেশীর ভাগই যেত উত্তরদিকে, কারণ পূর্বদিকে পাঞ্জাবের মরুভূমি তখনও শত যোজন জুড়ে পড়ে আছে, তাকে অতিক্রম করা অসাধ্য। যাহোক, বহির্জগতের সঙ্গে আর্যদের অল্প-স্বল্প মেলামেশা আরম্ভ হোল; সুমেরু পর্বতের ওপারে কৃষ্ণচক্ষু কৃষ্ণকেশ একজাতীয় মানবের সঙ্গে আলাপ হোল।

'এইভাবে আরও কয়েক শতাব্দী কেটে গেল। ইতিমধ্যে আর্যরা কৃষিকার্য শিখে ফেলেছিল, বুনো গমের বীজ বুনে শস্য ফলাতে আরম্ভ

করেছিল। কিন্তু তবু দেশের খাদ্যের অনুপাতে মানুষের সংখ্যা এত বেড়ে গিয়েছিল যে, খাদ্যের অনটন দেখা দিল। মৎস্য এবং গোধূম পর্যাপ্ত নয়।

'কিন্তু পুরুষানুক্রমে মৎস্যভোজনের ফলে আর্যদের বুদ্ধি খুব ধারালো হয়েছিল ; তারা দলে দলে খাদ্য অন্বেষণে বিদেশে যেতে লাগল। কিন্তু বিদেশে যাবার দুটি মাত্র পথ ; এক সমুদ্র, দ্বিতীয় উত্তর দিক। আর্যদের মধ্যে যারা মৎস্যজীবী, তারা নৌকা নিয়ে সমুদ্রে বেরিয়ে পড়ল। এরাই পরে পাণি বা ফিনিশিয়ান নামে পরিচিত হয়েছিল, দক্ষিণে লঙ্কা এবং উত্তরে ইংলণ্ড পর্যন্ত উপনিবেশ স্থাপন করিলেন।

'দ্বিতীয় দল গেল সুমেরুর গিরিসঙ্কট পার হয়ে মাটির পথে। আর্যদের উত্তরাভিযান আরম্ভ হল। এই অভিযান তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে পারস্য গ্রীস রাশিয়া পার হয়ে স্কাণ্ডিনেভিয়া পর্যন্ত পৌঁছেছিল।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'এ আপনি স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলছেন, না ইতিহাস বলছেন?'

পণ্ডিত বলিলেন,—'ইতিহাসে অন্য কথা আছে, আমি যা স্বপ্ন দেখেছি তাই বলছি। কিন্তু সাহেবের লেখা ইতিহাসই সত্য আর আমার স্বপ্ন মিথ্যা, তার প্রমাণ কি?'

পণ্ডিতকে ঘাঁটাইয়া লাভ নাই, বলিলাম,—'কোনও প্রমাণ নেই। তারপর বলুন।'

'তারপর আমার স্বপ্নের ক্লাইম্যাক্স।'

'যাক, স্বপ্ন তাহলে শেষ হয়ে আসছে? কিন্তু কৈ আর্যরা ভারতবর্ষে তো এল না!'

'এইবার আসছে। সেইখানেই ক্লাইম্যাক্স।'

পণ্ডিত আবার আরম্ভ করিলেন,—'উত্তর দিকে যারা অভিযান করল তারা অধিকাংশই ফিরে এল না, দু'চার জন ফিরে এল। যারা ফিরে এল তাদের মধ্যে একজনের নাম—ইন্দ্র।

'ইন্দ্র গোড়ায় মানুষ ছিলেন ; সাধারণ মানুষ, একজন যোদ্ধা। কিন্তু অসাধারণ তাঁর বুদ্ধি, দুর্দম সাহস। যুগে যুগে যে-সব মানুষ জাতিকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে, ইন্দ্র তাদেরই একজন। যুগাবতার বলতে পার। ইন্দ্র দলবল নিয়ে উত্তরদিকে গিয়েছিলেন, অনেক বছর পরে যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর সঙ্গে একপাল ঘোড়া! দেশের লোক আগে কখনও ঘোড়া দেখে নি, ঘোড়া দেখে চমৎকৃত হয়ে গেল। উচ্চৈঃশ্রবার নাম শুনেছ বোধ হয়। দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রেরই কেবল ঘোড়া ছিল আর কারুর ছিল না।

'ইন্দ্র ঘোড়া নিয়ে দেশে ফিরে এলেন, কিন্তু বেশী দিন চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। চুপ করে বসে থাকার লোক তিনি নন। আবার সদলবলে অভিযানে বেরুলেন। এবার পূর্বদিকে। ইন্দ্র স্থির করলেন, পূর্বদিকে কতদূর যাওয়া যায় তিনি পরীক্ষা করে দেখবেন। মরুভূমির পরপারে কী আছে? মরুভূমি কি পার হওয়া যায় না?

'ইন্দ্রের অশ্বারোহীর দল পূর্বদিকে চলল। বেলুচিস্থানের পূর্ব সীমানা থেকে মরুভূমি আরম্ভ হয়েছে। ইন্দ্র বারবার মরুভূমি উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। মরুভূমি তো নয়, জ্বলন্ত দাবানল। ব্যর্থ হয়ে ইন্দ্র মরুভূমির কিনারা ধরে উত্তর মুখে চললেন। হয় তো উত্তরে মরু পার হবার পথ আছে।

'কুটিল কর্কশ পথ; জলের বড় কষ্ট। তবু ইন্দ্র নিরস্ত হলেন না। মাসের পর মাস কেটে গেল, বছর কেটে গেল, ইন্দ্র পাহাড়-মরুর সন্ধি-

রেখা ভেদ করে চলেছেন। ঘোড়া ছিল বলেই পেরেছিলেন, পদব্রজে পারতেন না।

'কিন্তু পথ যত দুর্গমই হোক, কোথাও তার শেষ আছে। একদিন ইন্দ্র কাশ্মীর প্রান্তে গিয়ে পৌঁছুলেন। কাশ্মীর তখন ভূস্বর্গ নয়, প্রকাণ্ড একটি হ্রদ। ইন্দ্র দেখলেন হ্রদের জল কানায় কানায় টলমল করছে, তাকে সাপের মত বৃত্তাকারে ঘিরে রেখেছে কৃষ্ণবর্ণ পাহাড়ের শ্রেণী। ইন্দ্র অঞ্জলি ভরে জল পান করলেন ; দেখলেন মিষ্টি জল।

'হ্রদের দিকে চেয়ে চেয়ে ইন্দ্রের মস্তিষ্কে একটা প্রচণ্ড আইডিয়া খেলে গেল। আজকালকার দিনেও কোনও আমেরিকান বা রুশ ইঞ্জিনীয়ারের মাথায় এতবড় দুঃসাহসিক আইডিয়া সহজে আসে না। ইন্দ্র ভাবলেন, সিন্ধুকে অর্থাৎ সমুদ্রকে যদি কোনও মতে পর্বতরূপী বৃত্রাসুরের নাগপাশ থেকে মুক্তি দিতে পারি, তাহলে এই সিন্ধু নিম্নাভিমুখে মরুভূমির উপর দিয়ে ধাবিত হবে, যা এখন উষর মরুভূমি আছে তা জলসিক্ত হয়ে শ্যামল ভূমি হবে, মরুর উপর পথ তৈরি হবে······

'ইন্দ্র শুধু ভাবুক নয়, কর্মীপুরুষ! তিনি তাঁর ভাবনাকে কার্যে পরিণত করবার জন্যে মহা উদ্যমে লেগে গেলেন।

'কাজটি কিন্তু সহজ নয়, অনেক দিন লাগল। হ্রদের কিনারে কিনারে বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর ইন্দ্র একটা যায়গা পেলেন যেখানে পাহাড়ের বাঁধ কিছু দুর্বল, দু'চারটি বড় বড় পাথরের চাঁই সরাতে পারলেই জল নিকাশের একটা রাস্তা হয়। একবার একটা রাস্তা পেলে জল নিজের জোরেই রাস্তা প্রশস্ত করে নেয়, তখন আর তাকে ঠেকায় কে?

'ইন্দ্র ঐ পাথরগুলো সরাবার উদ্যোগ করলেন।

'কিন্তু মানুষের দৈহিক শক্তিতে ও পাথর সরানো সম্ভব নয়। ইন্দ্র

ঘোড়া লাগালেন ; চর্মরজ্জু দিয়ে পাথর বেঁধে ঘোড়ারা টানতে লাগল। প্রথম পাথর কিছুতেই নড়ে না, তারপর অনেক টানাটানির পর হঠাৎ হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ল।

'সঙ্গে সঙ্গে প্রবল তোড়ে জল বেরুতে লাগল। এত তোড় ইন্দ্রও আশা করেননি, রন্ধ্র পথে জলের উত্তাল ধারা সগর্জনে ছুটল। অন্য ঘোড়াগুলো রক্ষা পেল বটে কিন্তু ইন্দ্রের নিজস্ব ঘোড়াটা এই দুর্বার স্রোতের আঘাতে চূর্ণ হয়ে ভেসে গেল। ইন্দ্রের ঘোড়ার নাম ছিল—দধীচি।

পণ্ডিত চুপ করিলেন। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিলাম,—'তারপর ?'

পণ্ডিত বলিলেন,—'এইখানেই আমার স্বপ্ন শেষ। কিন্তু মন থেকে আরও কিছু জুড়ে দিতে পারি। সিন্ধুকে প্রবাহিত করার ফলে একদিকে যেমন পাঞ্জাব থেকে সিন্ধু পর্যন্ত সঞ্জীবিত হয়ে উঠল, অন্যদিকে তেমনি কাশ্মীর জলের তলা থেকে উঠে এল। ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে যে অলঙ্ঘনীয় প্রাকৃতিক ব্যবধান ছিল তা ভেঙে পড়ল। স্থলপথে বহির্জগতের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হল। ইন্দ্র এই কীর্তির কর্তা ; তাই ইন্দ্র দেবরাজ।'

আমি বলিলাম,—'একটা কথা। আপনার হিসেবে এই ব্যাপার ঘটেছিল আজ থেকে সাত হাজার বছর আগে। কিন্তু ইন্দ্র কি অত পুরোনো দেবতা ?'

পণ্ডিত বলিলেন,—'ইন্দ্র মানুষটা সাত হাজার বছরের পুরোনো বটে কিন্তু দেবত্ব লাভ করতে তাঁর আরও দু'হাজার বছর লেগেছিল। আজকাল মানুষের দেবত্ব লাভ যত সহজ, তখন তত সহজ ছিল না। সিন্ধু নদ

এবং আরও অনেকগুলি নদী বেরিয়ে পাঞ্জাবকে শস্যশ্যামল করে তোলবার পর আর্যরা অনেকে এসে সপ্তসিন্ধুর তীরে উপনিবেশ স্থাপন করলেন। নূতন দেশের সতেজ জল-হাওয়ায় আর্যদের এক নূতন সংস্কৃতি জন্মলাভ করল। পাঞ্জাবের এই নূতন আর্যরাই বরুণ দেবতাকে সরিয়ে ইন্দ্রকে প্রধান দেবতার পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। ইন্দ্রপূজার প্রথম দেশ হোল সেই দেশ, যাকে ইন্দ্র মরুভূমির বুক থেকে টেনে তুলেছিলেন।

দেশটা ইন্দ্রের দেশ বলে পরিচিত হল ; প্রাচীন দেশ অবশ্য বরুণের দেশই রইল। ইন্দ্রের দেশে যারা বাস করতে লাগল, তাদের নাম হল ইন্দ্র। কালক্রমে ইন্দ্র অপভ্রংশ হয়ে দাঁড়াল হিন্দু। এখনও সেই নাম চলে আসছে। আমরা হিন্দু, অর্থাৎ ইন্দ্রপূজক।'

'তারপর ?'

'তারপর ইতিহাস পড়। সূর্যবংশে সগর নামে এক রাজা ছিলেন শুনেছ বোধ হয়। কিন্তু তিনি ভারতবর্ষের লোক নন, সুমেরু দেশের রাজা প্রথম সারগণ, খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার অব্দের কথা। আর্যরা তখন সুমেরু পর্বতের উত্তরে অনেক রাজ্য স্থাপন করেছেন, আবার ভারতবর্ষেও তাঁদের উপনিবেশ পূর্বদিকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। সারগণ বা সগর রাজার এক পুত্র ষাট হাজার প্রজা নিয়ে কোনও কারণে আদিম জন্মভূমি ছেড়ে ভারতবর্ষে অভিযান করেছিল। শেষ পর্যন্ত তারা অযোধ্যায় এসে রাজ্য স্থাপন করেছিল।

'সেই থেকে সূর্যবংশের একটা শাখা ভারতবর্ষেই আছে। রামচন্দ্র হলেন সগর রাজার অধস্তন নবম পুরুষ ; তিনি ভারতবর্ষেই জন্মেছিলেন। এসব নেহাৎ হালের কথা।'

পণ্ডিত বোধ করি আরও কিছুক্ষণ তাঁহার স্বপ্নাপ্ত ইতিহাস শুনাইতেন,

কিন্তু এই সময় পণ্ডিতগৃহিণী আসিয়া বলিলেন,—'রবিবার ব'লে কি আজ নাওয়া খাওয়ারও ছুটি? যাও, স্নান করগে।'

পণ্ডিত স্নান করিতে চলিয়া গেলেন। আমি পণ্ডিতগৃহিণীকে বলিলাম,—'বৌদি, আপনার কর্তার পেট গরম হয়েছে। ওঁকে আর কাঁক্ড়া খাওয়াবেন না। বরং রাত্রে শোবার সময় একটু ত্রিফলার জল দেবেন।'

যুধিষ্ঠিরের স্বর্গ

দশ বৎসর আগে আমি যখন কটকে বাস করিতাম তখন যুধিষ্ঠির দাস আমার ভৃত্য ছিল। কুড়ি বছরের নিকষকান্তি যুবক, পান ও গুণ্ডির রসে মুখের অভ্যন্তর ঘোর রক্তবর্ণ; মাড়ির প্রান্তে ক্ষুদ্র দাঁতগুলি তণ্ডুলকণার মত লাগিয়া আছে; মোটের উপর যুধিষ্ঠিরকে সুপুরুষ বলা চলে না। সে মাঝে মাঝে আমার জামার পকেট হইতে টাকা-পয়সা চুরি করিত; বোধ করি নবপরিণীতা বধূ রম্ভা দাসীর শখের জিনিষ কিনিয়া দিবার জন্যই এই দুষ্কর্ম করিত। একদিন হাতে হাতে ধরা পড়িয়া গেল। প্রেমপীড়িত যুবকের অপরাধ কঠিন দণ্ডের যোগ্য নয়, বিশেষত যদি প্রেমের পাত্রীটি সুশ্রী সুচটুলা এবং চকিতনয়না হয়। মনে আছে যুধিষ্ঠিরকে সামান্য দু' এক ঘা দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলাম।

তারপর দশ বৎসরে আমার জীবনে নানা ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে। বোম্বাই শহরে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছি এবং সিনেমা সমুদ্রের তীরে চোরাবালির উপর অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া চলিয়াছি। সমুদ্রে নরভুক্ হাঙ্গর কুমীর আছে; তারও নিরাপদ নয়, পদে পদে অতলে তলাইয়া যাইবার ভয়। সিনেমার মরীচিকা-মোহে যে হতভাগ্য মজিয়াছে তাহার চিত্তে সুখ নাই।

যাহোক কোনও রকমে এখনও টিকিয়া আছি ইহাই ভাগ্য বলিতে হইবে। কাহাকেও এ পথে আসিতে উৎসাহ দিই না। অনেক অপকবুদ্ধি যুবক সিনেমা রাজ্যে প্রবেশ করিবার আশায় আমার কাছে

দরবার করিতে আসে; তাহাদের দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিই। তাহারা বুঝিতে পারে না আমি তাহাদের কত বড় সুহৃৎ।

একদিন সায়ংকালে বাড়ীর বারান্দায় একাকী বসিয়াছিলাম, একটি অপরিচিত লোক আসিয়া জোড়হস্তে প্রণাম করিল। অনুমান করিলাম, ইনিও একজন ভাবী চিত্রাভিনেতা, হিরোর ভূমিকা না হোক, অন্তত ভিলেনের ভূমিকা না লইয়া ছাড়িবে না।

ভ্রূকুটি করিয়া বলিলাম,—'কি দরকার বাপু?'

কর্ণচুম্বী হাস্যে অধরোষ্ঠ প্রসারিত করিয়া লোকটি বলিল,—'আজ্ঞে বাবু আমি যুধিষ্ঠির দাস।'

ভাল করিয়া দেখিলাম, যুধিষ্ঠিরই বটে। তাহার গায়ে সাটিনের ঝকমকে কোট, গলায় পাকানো চাদর, পায়ে কিড্-লেদারের পালিশ-করা জুতা। বেশ একটু মোটা হইয়াছে। যুধিষ্ঠির আমার টাকা চুরি করিয়াছিল বটে কিন্তু অনেকদিন পরে তাহাকে দেখিয়া আনন্দ হইল। বলিলাম,—'আরে তাই তো—এ যে যুধিষ্ঠির! আয় আয়! এখানে কোত্থেকে এসে জুটলি?'

যুধিষ্ঠির এবার গড় করিয়া পদধূলি লইল। বলিল,—'আজ্ঞে বাবু, বোম্বাই আসা হল—তা এখানে আপনি আছেন তাই পেন্নাম করতে এলাম।'

বলিলাম,—'তা বেশ করেছিস। উঠেছিস কোথায়?'

সে একটি হোটেলের নাম করিল যাহার দৈনিক ভাড়া পঁচিশ টাকা! বুঝিলাম যুধিষ্ঠির বড় মানুষ মালিক পাইয়াছে, তাহারই সহিত বড় হোটেলে উঠিয়াছে।

তাহাকে আদর করিয়া বেঞ্চিতে বসিতে বলিলাম; সে একটু

সঙ্কোচের সহিত বসিল। এদিক ওদিক দু'চার কথার পর প্রশ্ন করিলাম,—'তারপর তোর বৌ রম্ভা কেমন আছে? ছেলেপুলে ক'টি?'

রম্ভার নামে যুধিষ্ঠিরের মুখ বিবর্ণ হইল, সে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—'রম্ভা নেই, সে চলে গেছে বাবু।'

'চলে গেছে? কোথায় চলে গেল?'

'ছিনেমা করতে চলে গেছে। একটা ছিনেমা কোম্পানী এসেছিল, তাদেরই সঙ্গে পালিয়েছে।'

কিছুই বিচিত্র নয়। রম্ভার চেহারার চটক ছিল; হয়ত কোনও চিত্র প্রযোজকের নজরে পড়িয়া থাকিবে। জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কতদিন হ'ল পালিয়েছে?'

'সাত বছর হ'ল। যুদ্ধের আগেই পালিয়েছে। প্রথমে মাদ্রাজে ছিল, অনেকগুলো তামিল ছবিতে হেরোইন সেজেছিল। খুব নাম করেছিল বাবু।—এখন শুনেছি বোম্বাই এসেছে।'

তামিল ছবির খবর রাখি না; কিন্তু বোম্বাই আসিয়া কোনও স্ত্রীলোক হিরোইন সাজিলে আমি খবর পাইতাম। প্রশ্ন করিলাম,—'বোম্বাই এসে হিরোইনের পার্ট করছে রম্ভা?'

যুধিষ্ঠির বলিল,—আজকাল আর হিরোইনের পার্ট পায় না। বয়স গেছে, চেহারাও ভেঙেছে—আজকাল হেরোইনের মা'র পার্ট করে।'

হিরোইনদের অবশ্য ইহাই পরিণাম। তবে যাহারা বুদ্ধিমতী তাহারা সময় থাকিতে কিছু সঞ্চয় করিয়া লইয়া বিদায় গ্রহণ করে। সিনেমা যৌবনের ক্ষেত্র, বিগত যৌবনার স্থান এখানে অতি অল্প।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—'আবার বিয়ে করেছিস তো ?'

যুধিষ্ঠির বিতৃষ্ণাসূচক মুখভঙ্গী করিয়া বলিল,—'না বাবু, ন্যাড়া আর ক'বার বেলতলায় যায় ? মেয়েলোকের ওপর ঘেন্না ধ'রে গেছে।'

বুঝিলাম, সে বড় রকম দাগা পাইয়াছে। অন্য কথা পাড়িবার উদ্দেশ্যে বলিলাম,—'যাক্, তুই এখন কি কাজকর্ম করছিস বল্।'

যুধিষ্ঠির বলিল,—'কাজ আর এখন কিছু করি না। যুদ্ধের সময় খুব কাজ করেছিলাম বাবু। এখন ইচ্ছে হয়েছে ছিনেমার ছবি করব। তাই আপনার কাছে—' বলিয়া সলজ্জে ঘাড় বাঁকাইল।

হরি হরি! ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই সিনেমা। যুধিষ্ঠিরও সিনেমা করিতে চায়। হাসিও পাইল দুঃখও হইল। রম্ভা হেরোইন সাজিয়াছে তাই যুধিষ্ঠিরও হিরো সাজিয়া তাহার পাল্টা জবাব দিতে চায়। হায় মানুষের অভিমান!

গম্ভীর হইয়া বলিলাম,—'তা হয় না যুধিষ্ঠির। সিনেমার কাজ করতে গেলে চেহারাটা ওরই মধ্যে একটু ইয়ে হওয়া দরকার। তুই দুঃখ করিস নি—'

যুধিষ্ঠির বলিল,—'আজ্ঞে বাবু, আমি ছিনেমায় পার্ট করব না, টাকা দিয়ে ছবি তৈরি করাতে চাই।'

বলে কি যুধিষ্ঠির! সে অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর লোক বটে কিন্তু এত নির্বোধ তাহা ভাবি নাই। বিরক্ত হইয়া বলিলাম,—'টাকা দিয়ে ছবি তৈরি করাবি! তুই পাগল না ছন্ন? একটা ছবি করতে কত টাকা লাগে জানিস?'

'আজ্ঞে না বাবু।'

'একটা ছবি তৈরি করতে খুব কম করেও দেড় লাখ টাকা লাগে। পারবি দিতে?'

যুধিষ্ঠির ঘাড় চুল্‌কাইয়া বলিল,—'আজ্ঞে বাবু, তা পারব। যুদ্ধের সময় ঠিকেদারী করেছিলাম, মিলিটারিকে কুলি আর বাঁশ দিতাম—ভারি লাভের কাজ। তা কুড়িয়ে বাড়িয়ে দেড় লাখ টাকা দিতে পারব বাবু।'

অভিভূত হইয়া বসিয়া রহিলাম। আমার ভূতপূর্ব ভৃত্য যুধিষ্ঠির দেড় লাখ টাকার মালিক। আর আমি—! সে যাক্। কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। মিলিটারিকে বাঁশ দিয়া যুদ্ধের বাজারে অনেকেই লাল হইয়াছে, যুধিষ্ঠির হইবে না কেন? বিশেষত পরের পকেটে হস্ত প্রবিষ্ট করাইবার অভ্যাস তাহার পূর্ব হইতেই আছে। সে তো বড় মানুষ হইবেই। তাহার সাটিনের কোট ও কিড্-লেদার জুতার তাৎপর্য এতক্ষণ আমার কাছে একটু ঘোলাটে হইয়াছিল এখন তাহা ফটিক-জলের মত পরিষ্কার হইয়া গেল। দৈনিক কুড়ি টাকা ভাড়ার হোটেলের রহস্যও সমাধান হইল। কিন্তু আশ্চর্য, দেড় লাখ টাকার মালিক হইয়াও তাহার মাথা গরম হয় নাই; নহিলে সে আমার বাড়ীতে আসিয়া এমন কাঁচুমাচু ভাবে বেঞ্চিতে বসিয়া আছে কেন?

যুধিষ্ঠির বলিয়া চলিল,— '—ছিনেমার কাউকে তো চিনি না—শুনেছি চোর বাটপাড় অনেক আছে, ভাল মানুষের টাকা ঠকিয়ে নেয়। তাই আপনার কাছেই এলাম বাবু—আপনি আমায় একটা ছবি করে দেন।'

ভাবিলাম, যে দুর্লভ সম্ভাবনার গোলাপী স্বপ্ন দেখিয়া সিনেমা জগতের অর্ধেক মানুষ জীবন কাটাইয়া দেয়, তাহা যখন পায়ে হাঁটিয়া আমার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তখন তাহাকে অবহেলা করিব না। বরাত যদি খুলিয়াই থাকে, তাহাকে রোধ করিবে কে? যুধিষ্ঠির নিমিত্ত মাত্র।

বলিলাম,—'তোমার ছবি আমি ক'রে দেব। কিন্তু তুমি যে অর্ধেক টাকা দিয়ে হাত গুটোবে তা হবে না।'

যুধিষ্ঠির বলিল,—'বাবু আমি হাত গুটোব না। আপনি আমার দেড় লাখ টাকা নেন আর আপনার গপ্প থেকে আমায় একটা ছবি করে দেন। আর আমি কিছু চাই না।'

বলিলাম,—'বেশ। তুমি আমার নামে দেড় লাখ টাকা ব্যাঙ্কে জমা ক'রে দেবে, সেই টাকায় ছ'মাসের মধ্যে আমি তোমাকে ছবি তৈরি করে দেব—এই সর্তে কণ্ট্রাক্ট হবে। ছবি আমার যেমন ইচ্ছে তেমনি করব, তুমি হাত দিতে পাবে না। কেমন—রাজি?'

যুধিষ্ঠির কৃতার্থ হইয়া বলিল,—'আজ্ঞে বাবু আপনি যা বলবেন তাতেই রাজি। কেবল—ছবিতে আমার নামটাও একটু জুড়ে দেবেন, যাতে রম্ভা—মানে সবাই জানতে পারে—'

'তোমার নাম নিশ্চয় থাকবে—বড় বড় অক্ষরে থাকবে। তাহলে কালই অ্যাটর্নীর অফিসে গিয়ে দলিলপত্র তৈরি করে ফেলতে হবে। আর দেরি নয়।'

'আজ্ঞে যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল।' বলিয়া যুধিষ্ঠির আবার এক খাম্চা পায়ের ধূলা লইল।

হপ্তা খানেকের মধ্যে লেখাপড়া হইয়া গেল। যুধিষ্ঠির গুল মারে নাই, সত্যই দেড় লাখ টাকা আমার নামে ব্যাঙ্কে জমা করিয়া দিল। মহা উৎসাহে কাজে লাগিয়া গেলাম।

স্টুডিও ভাড়া লইয়া নট-নটী নির্বাচনের পালা আরম্ভ হইল। তাছাড়া আরও হাজার রকমের কাজ। আমি স্টুডিওর অফিসে বসিয়া সারাদিন কাজ করিতাম, আর যুধিষ্ঠির ঘরের এক কোণে চুপটি করিয়া বসিয়া

থাকিত। কত রকম লোকের যাতায়াত, নট-নটী পরিদর্শন—যুধিষ্ঠির কোণে বসিয়া পরম আগ্রহভরে দেখিত, কিন্তু কখনও আপনা হইতে কথা কহিত না বা কোনও কাজে হস্তক্ষেপ করিত না। তাহার টাকায় এত ব্যাপার হইতেছে ইহা দেখিয়াই তাহার আনন্দ।

এইভাবে দিন পনেরো কাটিবার পর একদিন যুধিষ্ঠির আফিসে আসিল না। সেদিন তাহার অনুপস্থিতি গ্রাহ্য করিলাম না, কিন্তু তাহার পর আরও দু'দিন আসিল না দেখিয়া ভাবনা হইল হয়তো অসুখে পড়িয়াছে। তাহার হোটেলের ঠিকানা জানা ছিল, অফিসের কাজকর্ম সারিয়া তাহাকে দেখিতে গেলাম।

অভিজাত শ্রেণীর হোটেল; তাহার পাঁচতলায় যুধিষ্ঠিরের স্যুট্। লিফ্টে চড়িয়া তাহার দ্বারে উপস্থিত হইলাম। এমন মানুষের মন, এত ব্যাপারের পরও যুধিষ্ঠিরের সহিত তাহার ঐশ্বর্যের সঙ্গতি স্থাপন করিতে পারি নাই, সে যে এককালে আমার আজ্ঞাবহ ভৃত্য ছিল সেই কথাটাই মনের মধ্যে বড় হইয়া আছে। কিংবা হয়তো যুধিষ্ঠিরের তৃণাদপি সুনীচ অন্তরটিই সত্য, তাহার ঐশ্বর্য অলীক, তাই উভয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিতে পারিতেছি না।

যুধিষ্ঠিরের ঘরের দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। টোকা দিতেই যুধিষ্ঠির দ্বার একটু ফাঁক করিয়া আমাকে দেখিয়াই সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। আমি বিস্মিত হইয়া ভাবিলাম—এ কি ব্যাপার!

ঘরের ভিতর হইতে ফিস্ ফিস্ কথার আওয়াজ আসিতেছে—

ঘরে নিশ্চয় দ্বিতীয় ব্যক্তি আছে। চলিয়া যাইব কিনা ভাবিতেছি এমন সময় দ্বার আবার খুলিয়া গেল। যুধিষ্ঠির অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে আমাকে অভ্যর্থনা করিল—

'আসুন বাবু, আমার ঘরে আপনার পায়ের ধূলো পড়ল, এ আমার সাত পুরুষের ভাগ্যি।

ঘরে প্রবেশ করিয়া বুঝিলাম, সেখানে খাওয়া দাওয়া চলিতেছিল। চা কেক্ প্রভৃতি রহিয়াছে, কিন্তু যে-ব্যক্তিটী এই আমন্ত্রণের অতিথি তাহাকে দেখিলাম না। আমার আকস্মিক আবির্ভাবে সে বোধ করি বাথরুমে লুকাইয়াছে।

বেশীক্ষণ থাকিলাম না। যুধিষ্ঠিরের স্বাস্থ্য যে ভালই আছে তাহাতে সন্দেহ নাই; উপরন্তু সে যদি এমনি কোনও কাজে লিপ্ত থাকে যাহা সে আমার কাছে লুকাইতে চায়, তবে সে বিষয়ে আমার কৌতূহল থাকা উচিত নয়। তবু মনে খট কা লাগিল। টাকা সর্বনেশে জিনিস; উপসর্গ জুটিতে বিলম্ব হয় না। যা হোক, ভরসার কথা, যুধিষ্ঠিরের অধিকাংশ টাকা এখন আমার হাতে, সে যে অসৎ সঙ্গে পড়িয়া সব কিছু উড়াইয়া দিবে সে সম্ভাবনা নাই।

পরদিন হইতে যুধিষ্ঠির আবার স্টুডিওতে আসিতে লাগিল। কিন্তু লক্ষ্য করিলাম, সে যেন সর্বদাই অন্যমনস্ক হইয়া থাকে, স্টুডিওর কার্য-কলাপে তাহার তেমন মন নাই।

ক্রমে মহুরতের শুভ-মুহূর্ত আসিয়া পড়িল। নট-নটী যন্ত্র-যন্ত্রী সব ঠিক হইয়া গিয়াছে।

মহুরতের আগের দিন সকাল বেলা যুধিষ্ঠির আমার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। হাত কচ্লাইয়া বলিল,—'বাবু একটা কথা বলব।'

জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কি কথা?'

আরও খানিকক্ষণ হাত কচ্লাইয়া যুধিষ্ঠির বলিল,—'রম্ভাকে ছবির হেরোইন করতে হবে।'

'রম্ভা! তাকে কোথায় পেলে?'

'আজ্ঞে—তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। সে বড় কষ্টে আছে বাবু—কেউ তাকে ছবিতে নেয় না—'

বলিলাম,—'এখন আর হতে পারে না, আমি অন্য হিরোইন নিয়েছি।'

'না বাবু তাকে নিতেই হবে।'

অত্যন্ত বিরক্ত হইলাম,—'তোমার মাথা খারাপ। নিজেই বল্‌চ, তাকে কেউ ছবিতে নেয় না, আমি নিলে আমার ছবির কি দশা হবে বুঝতে পারছ না? বুড়ো-হাব্‌ড়া দিয়ে হিরোইনের কাজ চলবে না। রম্ভা আবার তোমার ঘাড়ে চেপেছে দেখছি—সেদিন হোটেলে তাকেই চা কেক খাওয়াচ্ছিলে। তা খাওয়াও, আপত্তি নেই। কিন্তু তার জন্যে আমার ছবি নষ্ট করতে পারব না।'

তবু যুধিষ্ঠির ছাড়ে না, করুণ কণ্ঠে মিনতি করিতে লাগিল। আমি কিন্তু অটল রহিলাম। শেষে যুধিষ্ঠির হঠাৎ রাগিয়া উঠিল, বলিল,—'তবে আমার টাকা ফেরৎ দেন, আমি ছবি করব না।'

বলিলাম,—'আদালত থেকে টাকা আদায় কর গে যাও। তোমার এই দুর্মতি হবে জানতাম বলেই আগে থাকতে ব্যবস্থা করে রেখেছি।'

যুধিষ্ঠির তখন কাঁদিতে আরম্ভ করিল, হাউ হাউ করিয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিল। তাহার অশ্রুবিগলিত গদগদ কাতরোক্তিতে পাষাণও দ্রব হইয়া যায়। রম্ভা অবলা মেয়েমানুষ......নাচিতে গাহিতে জানে বলিয়াই না তার পতন হইয়াছিল! কিন্তু সেজন্য ভগবান তাহাকে যথেষ্ট শাস্তি দিয়াছেন—এখন পৃথিবীতে তাহার কেহ নাই, এখন যুধিষ্ঠির যদি তাহাকে সাহায্য না করে তো কে করিবে? বাবু, আপনি দয়া করুন—'

অবশেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া আমি বলিলাম,—'কেঁদো না,

শোনো। তাকে যে নেবই এমন কথা দিতে পারি না। কিন্তু তুমি তাকে স্টুডিওতে নিয়ে এস, যদি দেখে আমার পছন্দ হয় পার্ট দিতে চেষ্টা করব।'

যুধিষ্ঠির এই আশ্বাসে সম্মত হইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

সেদিন স্টুডিওতে গিয়া রম্ভাকে দশ বৎসর পরে আবার দেখিলাম। আমার সম্মুখে আসিতে লজ্জায় ও কুণ্ঠায় সে যেন ভাঙিয়া পড়িল। যে-মেয়ে দীর্ঘকাল সিনেমায় অভিনেত্রীর কাজ করিয়াছে তাহার পক্ষে এতখানি লজ্জা প্রশংসার কথা বটে। কিন্তু শুধু লজ্জায় তো কাজ চলে না। রম্ভার সে রূপ-যৌবন সে চমক-ঠমক কিছুই নাই। সাত বৎসরের অবিরাম নিষ্পেষণ তাহার দেহটাকে নিঙ্‌ড়াইয়া ভাঙিয়া ছিঁড়িয়া একেবারে তচনচ করিয়া দিয়াছে। বয়স বোধ করি এখনও ত্রিশ পার হয় নাই কিন্তু চেহারা দেখিলে মনে হয়, দ্বিতীয় বয়ঃসন্ধির কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

যুধিষ্ঠির নিকটে দাঁড়াইয়া দীনভাবে হাত কচ্‌লাইতেছিল, তাহাকে বাহিরে যাইতে ইশারা করিলাম। তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা বৃথা। দেখি যদি রম্ভাকে বুঝাইতে পারি।

যুধিষ্ঠির ঘরের বাহিরে গেলে আমি রম্ভাকে বলিলাম,—'একবার যুধিষ্ঠিরের সর্বনাশ ক'রে তোমার মন ওঠেনি, আবার তার সর্বনাশ করতে চাও?'

রম্ভা আমার পানে ভয়-চকিত একটা দৃষ্টি হানিয়া ঘাড় নীচু করিয়া ফেলিল। আমি নিষ্ঠুরভাবে বলিয়া চলিলাম,—'তুমি ছবির হিরোইন হ'লে ছবি একদিনও চলবে না, ওর দেড় লাখ টাকা ডুবে যাবে। ওকে আবার পথের ভিখিরি করতে চাও? ওর যখন টাকা ছিল না তখন

ওকে ছেড়ে পালিয়েছিলে, আজ ওর টাকা হয়েছে তাই আবার ওকে ধরেছ? তোমার শরীরে কি লজ্জা নেই? কি রকম রক্তচোষা মেয়েমানুষ তুমি?'

রম্ভা ব্যাকুলভাবে মুখ তুলিল; দেখিলাম, তাহার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইতেছে। সে ভাঙা ভাঙা গলায় বলিল,—'বাবু, আমি হিরোইন হ'তে চাইনি—ও-ই জোর ক'রে আমাকে···' বলিয়া মুখে আঁচল চাপিয়া কাঁদিতে লাগিল।

নরম হইয়া বলিলাম,—'বেশ। যুধিষ্ঠির বড় ভালমানুষ, তোমাকে ক্ষমা করেছে। তোমার গায়ে যদি মানুষের চামড়া থাকে তাহলে তোমারও উচিত ওর স্বার্থের দিকে নজর রাখা। যাও, যুধিষ্ঠিরকে বুঝিয়ে বলবে। আর যেন এসব হাঙ্গামা না হয়।'

প্রায় বুজিয়া যাওয়া গলায় রম্ভা বলিল,—'আচ্ছা বাবু।'

রম্ভা চলিয়া গেল। মনুষ্য হৃদয়ের বিচিত্র কুটিল গতি অনুধাবন করিয়া বিস্ময় অনুভব করিবার অবসর ছিল না, আশু একটা বড় রকম ফাঁড়া কাটিয়াছে বুঝিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলাম।

মহরতের দিন যুধিষ্ঠির আসিল না।

শূটিং আরম্ভ হইল। সাতদিন কাটিয়া গেল তবু যুধিষ্ঠিরের দেখা নাই। অভিমান করিয়া আছে ভাবিয়া তাহার হোটেলে আবার দেখা করিতে গেলাম।

যুধিষ্ঠির নাই। ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিতে পারিলাম, শেষের দিকে একটি স্ত্রীলোক আসিয়া যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বাস করিতেছিল, তারপর তাহারা এক সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে।

অতঃপর দীর্ঘকাল যুধিষ্ঠিরের দেখা নাই। ভাবিয়াছিলাম টাকার গরজে শেষ পর্যন্ত নিজেই আসিবে, কিন্তু সে আসে নাই। ছবি তৈয়ার হইয়াছে,

ছবিতে যুধিষ্ঠিরের নাম ছাপা হইয়াছে। বেশ ভাল দামে ছবি বিক্রয় করিয়াছি। ভারতবর্ষের সর্বত্র ছবি দেখানো হইতেছে। আমি টাকা ও খ্যাতির দিক দিয়া বিশেষ লাভবান হইয়াছি। যুধিষ্ঠিরেব ভাগেও আসলের উপর পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভ হইয়াছে। কিন্তু লাভের টাকা লইতে সে আসিল না। হতভাগ্য মূর্খ ঐ পতিতা স্ত্রীকে লইয়া কোথায় চলিয়া গেল।

* * * *

চলচ্চিত্র নির্মাণ সহজ কাজ নয়, শরীরে বেশ ধকল লাগে। তাই দ্বিতীয় ছবি আরম্ভ করিবাব আগে ভাবিলাম, কিছুদিনের জন্য কোনও নির্জন স্থানে গিয়া বিশ্রাম কবিয়া আসি। একজন ধনী বন্ধু সমুদ্র তীরে তাঁহার একটি প্রমোদভবনে আমাকে থাকিবাব অনুমতি দিলেন।

বোম্বাই হইতে চারিশত মাইল দক্ষিণে সাগরকূলে একটি নগর, তাহারই উপকণ্ঠে বন্ধুব নিভৃত নির্জন প্রমোদভবন। বছরের অধিকাংশ সময়েই বন্ধ থাকে, মাঝে মাঝে গৃহস্বামী আসিয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া যান।

বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, বাড়ীর রক্ষক-ভৃত্যরূপে বিরাজ করিতেছে—যুধিষ্ঠির।

বলিলাম,—'তুই এখানে!'

যুধিষ্ঠির আমাকে দেখিয়া প্রথমটা বোধ হয় সুখী হয় নাই, কিন্তু ক্রমশ সামলাইয়া লইল। তাহার পলায়নের কৈফিয়ৎ সে যাহা দিল তাহা এইরূপ: শহর বাজারের গণ্ডগোল আর তাহার ভাল লাগে না। রম্ভাও চেনা লোকের মধ্যে থাকিতে লজ্জা পায়। তাই তাহারা জনারণ্যের বাহিরে এই একান্তে আশ্রয় লইয়াছে। এখানে সে ত্রিশ টাকা মাহিনা পায়, তাহার উপর খোরাক পোষাক। বড় সুখে আছে তাহারা। তাহাদের কোনও আক্ষেপ নাই।

আমি বলিলাম,—কিন্তু তোর অত টাকা—'

যুধিষ্ঠির হাত-যোড় করিয়া বলিল,—'বাবু, ও টাকা আর আমাকে নিতে বলবেন না। আমরা বেশ আছি।'

কি জানি, হয় তো তাহার ভয় হইয়াছে টাকা এবং রম্ভা এক সঙ্গে তাহার ভাগ্যে সহ্য হইবে না। আমি পীড়াপীড়ি করিলাম না; ভাবিলাম যদি কোনও দিন তাহার মতিগতির পরিবর্তন হয় তখন তাহার টাকা ফেরৎ দিব, ততদিন আমার কাছে গচ্ছিত থাক।

ভারি আনন্দে এক মাস কাটিয়া গেল। যুধিষ্ঠির ভৃত্যের মতই আমার সেবা করিল। রম্ভা বোধ হয় লজ্জায় আমার সম্মুখে আসিত না; একবার চকিতের জন্য তাহাকে দেখিয়াছিলাম। রম্ভার চেহারার অনেক উন্নতি হইয়াছে। যৌবন আর ফিরিয়া আসে না, কিন্তু মনে হইল রম্ভা তাহার হারানো নারীত্ব ফিরিয়া পাইয়াছে।

চলিয়া আসিবার সময় যুধিষ্ঠির মিনতি করিয়া বলিল,—'বাবু, আমরা যে এখানে আছি তা কাউকে বলবেন না।'

টিকিট কিনিবার জন্য দশটাকার দশখানা নোট বাহির করিয়া পকেটে রাখিয়াছিলাম। স্টেশনে আসিয়া টিকিট কিনিতে গিযা দেখি, একটি নোট কম—নয়খানা আছে!

হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। যুধিষ্ঠিরের পুরানো অভ্যাস এখনও যায় নাই।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

— তিনখানি চমকপ্রদ ডিটেকটিভ উপন্যাস —

ব্যোমকেশের গল্প

ব্যোমকেশের কাহিনী

ব্যোমকেশের ডায়েরী

সাহিত্যের রস ষোল আনা বজায় রাখিয়াও যে উচ্চ-শ্রেণীর গোয়েন্দা-কাহিনী রচনা করা সম্ভব—উপরে উল্লিখিত তিনখানি উপন্যাসে তাহারই পরিচয় পাইবেন।

রহস্যময় পরিবেশ-সৃষ্টিতে
শরদিন্দুবাবুর যে অসাধারণ দক্ষতা আছে—
এই উপন্যাস তিনখানিই
তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

প্রতি বইখানির দাম দুই টাকা।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা